দাম ঃ দশ টাকা

স্বস্তিকা

নববর্ষ সংখ্যা ১৪১৭ ★ ১২ এপ্রিল, ২০১০

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ● ৭

হিন্দুত্ব ভারতের আত্মা ❖ মোহনরাও ভাগবত ● ৯

ভারতের জাতীয়তা হিন্দুত্ব ঃ বিকৃতি ও স্বীকৃতি ❖ সত্যনারায়ণ মজুমদার ● ১৩

ভারতের নবজাগরণের তিন হিন্দু যোগী ❖ ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী ● ১৯

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রভাব ❖ নিখিলেশ গুহ ● ২৫

গান্ধীজী ও হিন্দুত্বের আহ্বান ❖ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ● ২৯

হিন্দুত্ব ও স্বামী প্রণবানন্দ ❖ ডঃ শঙ্কর ভট্টাচার্য ● ৩৩

হিন্দুর কল্যাণে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ❖ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ● ৩৭

দেশভাগ ঃ হিন্দুর যন্ত্রণা ❖ শ্যামলেশ দাশ ● ৪১

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ❖ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ● ৪৪

হিন্দুর বিপদ কোথা থেকে ❖ তথাগত রায় ● ৪৬

হিন্দুর আশঙ্কা ঃ অনুপ্রবেশ ঃ পশ্চিমবঙ্গে সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন ❖ বিমল প্রামাণিক ● ৪৯

হিন্দু বিদ্বেষে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ❖ গূঢ়পুরুষ ● ৫১

হিন্দুর উদাসীনতা ঃ ধর্মান্তরকরণ ❖ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ● ৫৩

ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে হিন্দু ও হিন্দুত্ব ❖ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ● ৫৭

ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন ব্যাখা ও সামরিক বাহিনী ❖ মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী ● ৬১

হিন্দু নিগ্রহ ঃ সেকাল থেকে একাল ❖ নবকুমার ভট্টাচার্য ● ৬৫

পদ্মাপারের হিন্দু ❖ অরিন্দম মুখার্জী ● ৬৯

বিদেশে হিন্দুত্ব ❖ নৃপেন আচার্য্য ● ৭৭

আধুনিক হিন্দুর বিপ্লব ঃ রামমন্দির আন্দোলন ❖ পবিত্র ঘোষ ● ৮২

স্বস্তিকা

নববর্ষ সংখ্যা

৬২ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১২

১২ এপ্রিল, ২০১০

সম্পাদকীয়

হিন্দুত্ব

হিন্দুত্ব আজ আমাদের দেশে বহু বিতর্কিত ও আলোচিত বিষয়। তবে এই বিতর্ক নতুন নহে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও তাহা লক্ষ্য করি। একদিকে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় জীবনধারার অনুকরণ, অন্যদিকে অতীত ভারতের কীর্তিগাথার পুনরুজ্জীবন। এই দুই ধারার সমন্বয়বাদীদের একাংশ পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে নয়, হিন্দুত্বের ভিত্তিতেই জাতীয় জাগরণ তথা বিশ্ব শান্তির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। লক্ষণীয় বিষয়, এই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রথম বিদ্যায়তনের নাম 'হিন্দু কলেজ'। ইয়ং বেঙ্গলের সমস্ত সভ্যই হিন্দু সন্তান। দেশীয় শিল্প প্রসারের জন্য নবগোপাল মিত্র যে মেলার আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার নাম 'হিন্দু মেলা'। ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার বিষয়—'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা'। পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবেই হউক বা প্রতিক্রিয়াতেই হউক, কী সাহিত্যকর্মে, কী বক্তৃতায়, কী ধর্ম বা শিক্ষা সংস্কারে লক্ষ্য কেন্দ্র হিন্দুভাব, হিন্দুধর্ম, হিন্দু সমাজ।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ভোট রাজনীতির স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। যাহা কিছু হিন্দুভাবাপন্ন তাহাকেই সাম্প্রদায়িক বলিয়া চিহ্নিত করিবার অপপ্রয়াস চলিতেছে। বিশেষত একটি শক্তি হিসাবে আর এস এসের উত্থানে মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের উদ্বেগ হিন্দুত্বকে বিতর্কের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। কেননা আর এস এসের মূল আদর্শই হইল হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব বা জাতীয়তা। আবার অন্যদিকে হিন্দু মূল্যবোধে বিশ্বাসী অথচ আর এস এস ও তাহার সহযোগী সংগঠনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ নয় এমন বহু মানুষের কৌতুহল, প্রশ্ন ও উদ্বেগ হিন্দুত্বকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়াছে। বিতর্কের আরও একটি-দুইটি কারণ রহিয়াছে। যেমন, যাহারা প্রতিটি বিষয়কেই হয় সাদা নয় কালো এমন খাড়াখাড়িভাবে দেখিতে অভ্যস্ত, হিন্দুত্ব তাহাদের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, বিশেষত যখন আর এস এসের মতো সংগঠনও প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে হিন্দুত্বের ব্যাখ্যা সম্ভব, সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কেননা সত্যের নিরন্তর অনুসন্ধানই হইল হিন্দু জীবনধারার বৈশিষ্ট্য। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত সমাজের একটি অংশ হিন্দুত্বকে পুরাতনপন্থী পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল এবং দেশের আর্থ-সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে বৃহত্তম প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করে। হিন্দুত্ব লইয়া আলোচনা বা বিতর্কের কারণ হিসাবে এইসব বিষয়গুলিকে অস্বীকার না করিলেও দেখা যাইতেছে, সারা দেশ জুড়িয়া বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার তৃণমূলস্তরের কর্মী হিন্দুত্বের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের সার্বিক সমৃদ্ধি তথা বিশ্বের কল্যাণের জন্য হিন্দুত্ব অপরিহার্য বলিয়া তাহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

সাম্প্রতিককালের কয়েকটি ঘটনা, যেমন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয়, কেন্দ্র সরকারের নিকট লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট পেশ, সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ কমিশনের সুপারিশকে বর্ম করিয়া রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম তোষণ নীতির প্রতিযোগিতা হিন্দু সমাজকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। লক্ষণীয় হইল, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায়ে হিন্দুত্বকে জীবনধারা (ওয়ে অফ লাইফ যাহা মানবতারই নামান্তর) বলা হইলেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাহাকে অস্বীকার করা বা এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। অন্যদিকে ধর্মান্তরকরণ ও ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে হিন্দুরা আজ আক্রান্ত। দেশভাগের ষাট বৎসর পরেও জনভারসাম্যের পরিবর্তন ও অনুপ্রবেশের ফলে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তির অশনি সংকেত লক্ষ্য করিতেছে হিন্দুরা। ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলার দিকে তাকাইলে পরিস্থিতির ভয়াবহতার সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। সঙ্গত কারণেই তাই হিন্দুত্ব আবার মুখ্য চর্চার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুত হিন্দুত্ব হইল একগুচ্ছ মূল্যবোধ—Culture of India—যাহার মূল বৈশিষ্ট্য 'বিবিধতার মধ্যে একতা'—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সত্য এক ব্যাখ্যা বহু (একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি)। হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মোমিন-কাফের ইত্যাদি কোনও ভেদ রেখা টানা হয় নাই। বিশ্বের সকল মানুষই 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ—সকলেই সুখী হউক তাহার প্রার্থনা। হিন্দুত্ব কোনও দলীয় রাজনৈতিক এজেন্ডা নহে—রাজনীতির উর্ধ্বে এক জাতীয়ভাব—আবেগাত্মক একাত্মতা। ভারতবর্ষের এই মহান দর্শন, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যেহেতু হিন্দুদের দ্বারাই বিকশিত তথা হিন্দু সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই বিবর্তিত হইয়াছে, তাই হিন্দুত্বই ভারতীয়ত্ব। হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব সমার্থক। ভারতীয় মাত্রই হিন্দু—উপাসনা পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন। এইরকম মহান উদার সর্বব্যাপী দর্শন থাকা সত্ত্বেও সেই বিষয়ে আমাদের পাহাড়-প্রমাণ অজ্ঞতা এবং ইংরেজদের কূট-কৌশলের কারণে আত্মপরিচয় বিস্মৃত হইয়াছি। সাম্প্রদায়িক বলিয়া অভিযুক্ত হইবার আশঙ্কায় হীনমন্যতায় ভুগিতেছি। আত্ম-পরিচিতি সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন হই এবং সগর্বে তাহা ঘোষণা করি, তাহা হইলেই আমাদের জাতীয় পরিচিতির পুনর্জাগরণ ঘটিবে। এই প্রয়াসের ভিত্তি হইল হিন্দুত্ব। এই কারণেই বর্তমান বঙ্গাব্দের (১৪১৭) নববর্ষ সংখ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে 'হিন্দুত্ব'-কে গ্রহণ করা হইয়াছে।

হিন্দুত্ব ভারতের আত্মা

মোহনরাও ভাগবত

আজ সারাদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার পর মনে হচ্ছে পুরো সেমিনারটিতেই আমার উপস্থিতি থাকলেই ভাল হোত।

এটি এমন একটি সেমিনার যেখানে বুদ্ধিজীবীগণ তাদের ভাব-ভাবনা প্রকাশ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আমি নিজেকে একজন বুদ্ধিজীবী বলে মনে করি না, জগতের কেউই তা করে না। আমি নিজেকে একজন তৃণমূলস্তরের কর্মী বলেই মনে করি। অতএব আমি যা বলব তা হয়তো, আগেই কারো বলা হয়ে গেছে। আর হিন্দুত্ব সম্পর্কে বলা তো খুবই কঠিন। হিন্দুত্বের নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি না বুঝলে হিন্দুত্বকে বোঝাও কঠিন।

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো আমরা দুইশত বৎসর যাবৎ ইংরেজদের শাসনাধীন ছিলাম। বিশেষ করে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের পর, ওদের একান্ত প্রচেষ্টা ছিল আমাদের হিন্দু বৈশিষ্ট্যগুলি ভুলিয়ে দেওয়া এবং তাদের দেওয়া কাঁচের মধ্য দিয়ে সব কিছুকে দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা। অর্থাৎ কয়েক বছরের এইরকম প্রচেষ্টার পর শুধু মাত্র কয়েকশ' লোকই থাকবে যারা হিন্দুত্বকে হিন্দু বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়েই দেখবে।

হিন্দুত্ব নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করব তখন এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। প্রশ্ন হলো, 'যত মত, তত পথ' হলো আমাদের বিশ্বাস, তাহলে আর তাকে সীমানা দিয়ে বাঁধা কেন? অতএব আমি মনে করি হিন্দুত্বকে কোনওভাবেই ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনই

নেই। তাতে বরং বিভ্রান্তিই আসতে পারে। হিন্দুত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেয়ে, কারা কারা এই হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত তা নিরুপণ করাটা আরও কঠিন, তবে কঠিন হলেও আমরা অন্তত হিন্দুত্ব বোঝাতে কিছু কিছু মূল্যবোধের উল্লেখ করতে পারি। এ ব্যাপারে বীর সাভারকরের দেওয়া সংজ্ঞাই হল সবচেয়ে সরল ও কার্যকরী—

"আসিন্ধু সিন্ধু পর্যন্তা যস্য ভারত ভূমিকা।
পিতৃভু পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।।

(হিন্দু তিনিই যিনি সিন্ধুনদ ও সমুদ্রের মাঝখানের ভূমিকে নিজের পিতৃভূমি বলে মনে করেন এবং যা তার কাছে এক পবিত্র ভূমিও।)

আমার মতে, সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞাটি দিয়েছিলেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার। 'হিন্দু' কে তার সংজ্ঞা ঠিক করার দায়িত্ব বুদ্ধি জীবীদের। আমরা শুধু কথাটি ব্যবহার করি। দাবি করা হয় তিনি নাকি বলেছিলেন, যিনি নিজেকে হিন্দু বলেন, তিনিই হিন্দু, যার পূর্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন তারাই হিন্দু, এবং যাকে আমরা হিন্দু বলে ডাকি তিনিই হিন্দু। (এই কথাগুলির পিছনে কোনও প্রামাণ্য দলিল নেই। তাই যা কিছু হেডগেওয়ারজীর মুখে বসিয়ে দেওয়া সহজ। কেউ বিরোধিতাও করবে না।)

আমরা সব সময়ে বলে থাকি হিন্দুত্ব একটি জীবন ধারা, 'রিলিজিয়ন' নয়। ইংলণ্ডে 'রিলিজিয়নে'র তক্‌মা দ্বারাই সব প্রাপ্তি ঘটে, সে মুসলমানই হও, খৃস্টানই হও, কিংবা বৌদ্ধ, জৈন বা এমনকী বৈষ্ণব এবং শৈব। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তি কখনও ঘটে না। আদালতও রায় দেয় যে এই ধরনের দানছত্র (চ্যারিটি কনসেশন) হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ হিন্দু একটি জীবন ধারার নাম, 'রিলিজিয়ন' নয়।

আমাদের মৌলিক চিন্তাধারার ভিত্তি হলো একাত্ম মানবতাবাদ, সমগ্র বিশ্বকে এক বলে মনে করা। আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির মূল পাঠও মানবতাবাদ। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত—কোথাও হিন্দু শব্দটি নেই। আমাদের প্রয়োজনও হয়নি। আমরা সব সময় জোর দিয়েছি এই ব্যবহারের উপরে যে তুমি আমার বিশ্বাসকে সম্মান কর এবং আমি, তোমার বিশ্বাসকে কেবল সম্মানই করি না, আস্থা প্রকাশ করি যে আমরা উভয়েই একই ঈশ্বরের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ লাভ করব, যে পথই আমরা অনুসরণ করি না কেন।

এ ব্যাপারে উপনিষদে একটি গল্প আছে। প্রশ্ন করা হয়েছিল আত্মার প্রকৃতি কী? চরম সত্য কী? কোন্ প্রকারের সত্যকে তুমি পূজা কর? একজন বলল ঃ "আমি বায়ুকে ব্রহ্মরূপে পূজা করি (বায়ু ব্রহ্ম)"। আর একজন বলল ঃ "আমি অগ্নিকে সত্য রূপে আরাধনা করি (অগ্নি ব্রহ্ম)।" তখন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে প্রত্যেকেই চরম সত্যের একটা না একটা অংশকে আরাধনা করছে। সব কিছু মিলিয়েই সত্য।

আমি একবার আচার্য মহাপ্রাজ্ঞর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের ধর্ম আলাদা, কিন্তু আমাদের সামাজিক কাঠামো হিন্দু। সংস্কৃতি হিন্দু এবং নেশনও হিন্দু। এটি সম্পূর্ণভাবেই একটি প্রাচীন ধারণা।" আমাদের চিন্তাবিদগণ এ নিয়ে চর্চা করেছেন এবং তা আমাদের সাহিত্যেও জায়গা পেয়েছে। সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্যে উল্লেখ আছে—

হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরং।
তং দেবনির্মিতং দেশম্ হিন্দুস্থানম্ প্রচক্ষতে।।

(এই নেশনটিই হলো হিন্দুস্থান যার শুরু হিমালয় থেকে এবং যা ইন্দু সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নেশনটি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট।) এর তিন দিক ঘেরা সমুদ্র দিয়ে এবং এর পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে রয়েছে হিমালয় আর হিন্দুকুশ। এই অবস্থানই আমাদের বহিঃ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সমস্ত ভারতীয়দের পূর্বপুরুষগণই হিন্দু এবং সেই কারণে এখানে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু। এটাই সত্য; এটা বুঝতে হবে এবং সকলকে তা গ্রহণ করতে হবে। সঙ্ঘ যখন সকল হিন্দুর সংগঠনের কথা বলে তখন তা সকল ভারতীয়দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সংবাদ-মাধ্যমগুলি সবসময় জিজ্ঞাসা করে, সঙ্ঘ কেন মুসলমানদের সদস্য করে না এবং কেবলমাত্র হিন্দুদেরই করে? হ্যাঁ, আমরা কেবল হিন্দুদেরই সদস্য করি। কারণ আমরা এদেশের সকলকে হিন্দু বলে মনে করি; ব্রাহ্মণ, হরিজন, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান অথবা খৃস্টান হিসাবে আলাদা গণ্য করি না। যারাই ভগবৎ ধবজ-এর কাছে এসে মাথা নত করে তারা সকলেই হিন্দু। কিছু লোক আমাকে বলেছিল, "আমরা বিশ্বাস করি আমরা হিন্দু, কিন্তু আমরা একথা যদি জনসমক্ষে বলি তাহলে আমরা ট্যাক্স ছাড় পাব না। আমাদের সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেই কারণে আমরা দরখাস্তে জানাই যে আমরা হিন্দু নই। দয়া করে আমাদের ভুল বুঝবেন না।" আমি তাদের বলি, 'আমরা অবশ্যই আপনাদের এই ধরনের কাজের বিরোধিতা করি। এর ফলে তো আপনারা মৌলিক পরিচয়ই হারিয়ে ফেলবেন।' প্রত্যেককে এই সত্য উপলব্ধি করানো যে তারা হিন্দু এবং সেইসঙ্গে এক শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তোলা যা যে কোনও ধরনের আক্রমণকারীকে আমাদের হিন্দুদের আঘাত দেওয়ার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বাধ্য করাবে—এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু কেমন করে আমরা তা করব এবং কিভাবেই বা হিন্দুত্বের অর্থ ব্যাখ্যা করব? হিন্দুত্ব মানেই মুসলিম বা খৃস্টান বিরোধিতা নয়, হিংসা, তা যত ছোট আকারেই হোক না, তা হিন্দুত্ব নয়। অনুরূপভাবে, হিন্দুত্বকে নানা ধরনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আসতে হয়, যেমন, শিবাজী মহারাজ কি একজন প্রকৃত হিন্দু ছিলেন না? ন্যায় ও শান্তির প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আফজল খাঁকে কি তিনি ঠকাননি? এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, "হ্যাঁ, আমি আফজল খাঁ-কে ঠকিয়েছি। যদি সেইরকম অবস্থা আসে আমি আবার শঠতার আশ্রয় নেব। আফজল এসেছিল আমাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় বিজাপুর নিয়ে যেতে। আমার কি আত্মসমর্পণ করা উচিৎ ছিল, না কি মৃত্যুবরণ করা?" আপনাদের কি মনে হয় শিবাজী মহারাজ একজন ঠগ ছিলেন? এটা রাজনীতি। সকলের ভালোর জন্য দেশের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কাউকে নিকেশ করাটা জরুরি।

হিন্দুত্ব আমাদের মিশন। হিন্দুত্ব নিয়েই আমরা জয় করব অথবা

আমরা শেষ হয়ে যাব। এটা আমাদের ঐশ্বরিক কাজ। আজকের মূল চিন্তার বিষয় হলো, আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা। চিন্তার বিষয়টি সরল নয়, এটি দুই প্রকারের। এটা স্পষ্ট যে হিন্দু সমাজ আজ আক্রান্ত এবং এক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। এর পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রত্যাঘাত আসবেই। একথা জেনেও হিন্দু সমাজকে উঠে দাঁড়াতেই হবে এবং সমস্ত আঘাতের বিরুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। কারণ হিন্দু সমাজের জয় মানেই মানবতাবাদের জয়। এই লড়াই চলবে যতক্ষণ না আমরা জয়লাভ করি। এই কারণেই এই লড়াই চলছে গত ১২০০ বছর ধরে। আমরা অবশ্যই এই লড়াই জিতব। এই লড়াই দ্বিমুখী। একদিকে লড়াই চালাতে হবে আমাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। এই থেকেই গড়ে উঠবে বহুত্বের ধারণা। মানুষ বুঝতে পারবে বিবেকানন্দ'র হিন্দুত্ব, হেডগেওয়ারজীর হিন্দুত্ব, সাভারকারজীর হিন্দুত্ব, সঙেঘর হিন্দুত্ব, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিন্দুত্ব এবং বজরং দলের হিন্দুত্বের বৈচিত্র্য। হিন্দুত্ব কখনও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে না। এর কোনও ব্র্যাণ্ডও নেই। এর উপর কারও একাধিপত্যও নেই।

হিন্দুত্ব হচ্ছে একটি ক্রিয়াশীল সত্যের পিছনে নিরন্তর সন্ধানী প্রয়াস। তাই একে একটি ব্র্যাণ্ডের অধীন মনে করাটাই ভুল। হিন্দুত্ব ভারতের আত্মা। যেদিন আমাদের রাষ্ট্র এর ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হবে, সেদিনই ভারত হবে বিশ্ববরেণ্য নেতা। এর কোনও বিকল্প নেই। হিন্দুত্ব একটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আমাদের দৃষ্টিতে হিন্দুত্ব সব রাজনৈতিক দলেরই এবং সেই সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলই একান্ত আমাদের নয়। হিন্দু আন্দোলন মানুষের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী ও হিন্দুত্ব-বিরোধী বলে বিভাজন করে না। হিন্দুত্ব আমাদের পরিচিতি এবং আমাদের জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয়তা।

আমাদের এই পরিচিতি সম্পর্কে যদি আত্মোপলব্ধি হয় এবং গর্বের সঙ্গে উঠে দাঁড়াই, তাহলে তা আমাদের জাতীয় পরিচিতির জাগরণ ঘটাবে। আমাদের প্রচেষ্টার ভিত্তি হলো হিন্দুত্ব। এটাই আমাদের পরিচিতি। এ থেকেই সৃষ্ট হয় এক পরিমণ্ডল যার মধ্য দিয়ে ঘটে মানব জাতির সর্বাত্মক উন্নয়ন আর এটাই হলো মানবতাবাদের সমার্থক। হিন্দুত্ব হলো সমগ্র জগতের প্রয়োজন।

পণ্ডিত দীনদয়ালজী 'একাত্ম মানববাদ' দর্শন-এর প্রস্তাবক। এটিও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুত্বের প্রয়োগ। এর ভিত্তিতে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। হিন্দু সমাজকে এটা শেখাতে হবে। বিভেদ ও দুর্ব্যবহার দূর করতে হবে। মহিলাদের উত্থানের জন্য হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত এক নতুন মডেল গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। এই লড়াই চলছে প্রতিটি পরিবারে। পরিবার হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেখানে আমাদের সমস্ত মূল্যবোধ, জ্ঞান, ঐতিহ্য সংরক্ষিত থাকে অত্যন্ত সুচারুরূপে। অতএব আমাদের পরিবার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। ★

[ভারতীয় বিচার মঞ্চ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সমাপ্তি ভাষণের সংক্ষিপ্তসার]

ভারতের জাতীয়তা হিন্দুত্ব বিকৃতি ও স্বীকৃতি

সত্যনারায়ণ মজুমদার

ভারতবর্ষের জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয়তা সম্পর্কে আজও ভারতীয়দের মনে যে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়, তার অন্যতম কারণ হলো— স্বাধীনতা লাভের পর প্রদীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও জাতীয় নেতৃবর্গ জাতিকে 'স্ব'-এর বোধ দানে অসমর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তা বিষয়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি ইংরেজরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূর্তির জন্য করতে থাকে এবং জাতীয় ভাবনার প্রবাহকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা চালায়। জেমস্ মিল এবং লর্ড মেকলে এই বিকৃতির বীজ রোপণ করে আর ম্যালকাম, কর্নেল টড্, গ্র্যান্টডফ্, মেকালিক এবং স্যার জন শীলে প্রভৃতি লেখক ও ঐতিহাসিকগণ তার গতি প্রদান করে।

১৯১৭ সালে 'হিস্ট্রি অফ বৃটিশ ইণ্ডিয়া' লেখার উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু জাতিকে বিশ্বের মধ্যে হীন প্রতিপন্ন করা। ফলে গ্রন্থটিতে 'হিন্দু' শব্দের অর্থ ঘৃণাবাচক রূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। ভারতবর্ষকে একটি মহাদ্বীপ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করে পৃথকতাবাদ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিতভাবে ভারতবর্ষকে বহুজাতিক দেশ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়— ম্যালকামের দ্বারা শিখেদের ইতিহাস, গ্রান্টডফ দ্বারা মারাঠাদের এবং কর্নেল টডের দ্বারা রাজপুতদের ইতিহাস লেখার মাধ্যমে। এলিফিস্টন্, জন ব্রাইট প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ভারতে বহুজাতি রয়েছে বলে বর্ণনা করেন। ১৮৮৪ সালে স্যার জন স্ট্রেচী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে উদ্ধতভাবে বলেছিলেন— "This is the first and most essential thing to learn about India - that there is not and never was an India"।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণ এই শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইংরেজদের মস্তিষ্কপ্রসূত সিদ্ধান্তগুলি

স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজ শাসনকে 'ভগবানের দান' বলেই মনে করতে থাকে। ১৮৮৫ সালে হেনরী কার্টন 'নিউ ইণ্ডিয়া' পুস্তকে লেখেন যে ভারতে এক নতুন রাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে (Nation in Making)। যার প্রভাবে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী নিজ আত্মচরিতের নাম দেন Nation in Making । জওহরলাল নেহরু রচনা করেন Discovery of India, যাতে হিন্দুদের বিদেশী আক্রমণকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিকৃতির ব্যাপকতা লক্ষ্য করে 'রাষ্ট্র' শব্দের মূল ধারণার বিচার অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জগতে রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তার আয়ু হলো কেবলমাত্র ৫-৬ শত বছর। ইটালির রাষ্ট্রবিদ ম্যাকিয়াভেলিকে যার জনক বলা যায়। 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটানিকা' অনুযায়ী ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পরই পাশ্চাত্য জগতে জাতীয় ভাবনা সৃষ্টি হয়। ১৮৭০ সালে জার্মানী ও ইতালির ঐক্যসাধন এই ভাবনার সফল পরিচায়ক। প্রসিদ্ধ বিদ্বান 'রূপর্ট ইমরসন্' তাঁর গ্রন্থ "France Empire two Nation : the rise of self Assertion of Asian and African People"-তে লিখেছেন যে, এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে জাতীয়তার বিচার প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর সৃষ্টি হয়, কেউ কেউ তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তার ভাবনা সৃষ্টির কথা বলেছেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে যে রাষ্ট্রভাবনা বা তার গঠন পদ্ধতি সমান নয়, সেকথাও 'স্নায়োডার' স্বীকার করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় বিকাশক্রম ভিন্ন ভিন্ন।

পশ্চিমী চিন্তবিদগণ সাধারণত সমান দেশ, সংস্কৃতি, ভাষা, উপাসনা পদ্ধতি তথা জাতিকেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উপাদান বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এগুলির সবই রাষ্ট্রগঠনে প্রয়োজন হয় না। মূলত রাষ্ট্র বিষয়ে পাশ্চাত্য বিচার রাজ্যমূলক ও অর্থমূলক। কারণ সর্বোপরি সমান শাসন ব্যবস্থাকেই তারা রাষ্ট্রের মূল উপাদান হিসাবে নির্ণয় করেছে।

ভারতের রাষ্ট্রীয়তা বিকাশের ক্ষেত্রে একই মানদণ্ড প্রয়োগের চেষ্টা পশ্চিমী বিদ্বানগণ করেছেন। 'এম্প্রে' তার পুস্তক "Indian search of National Identity" -তে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতে বহু ভাষা, জাতি, বর্ণ, শাসন ইত্যাদি থাকাতে ভারত এক রাষ্ট্র নয়।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ রাজ্য ও রাষ্ট্রের পার্থক্য পূর্ব থেকেই জানতেন। রাষ্ট্র যেখানে এক সজীব ভাবাত্মক একক সেখানে রাজ্য কেবলমাত্র এক যন্ত্র বিশেষ বলেই তাঁরা বুঝেছিলেন। তাঁরা জানতেন রাষ্ট্র কেবল এক রাজনৈতিক তথা আর্থিক একক নয়, পরন্তু এক নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক একক। মূল কথা হলো, এই উপাদানই ভারত রাষ্ট্রের প্রধান পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ আদি ব্যক্তিগণ এই উপাদানের গুণগানই করেছেন। অরবিন্দ বলেছেন, সনাতন ধর্মই হলো আমাদের জাতীয়তা। রাষ্ট্রীয়তার প্রয়োজনীয় উপাদানে প্রথম থেকেই এখানকার জনসমষ্টির সঙ্গে ভূমির এক অটুট সম্বন্ধের প্রাধান্য যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি একই সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, সুখ-দুঃখের সমভাবনা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রবাহ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। এই কারণে ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই শাসন প্রণালী বিভিন্ন থাকলেও সাংস্কৃতিক ঐক্যের স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং যাকে প্রবহমান রাখার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের এক

সমগ্র বিশ্বের মানবকে হিন্দু সংস্কৃতি কখনও বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীতে বিভাজিত করেনি। কারণ এর মান্যতা হলো— ঈশাবাস্যমিদংসর্বম— তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ'— যার চিন্তন হল আত্মবৎসর্বভূতেষু— সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। তাই হিন্দুর কাছে বসুধৈবকুটুম্বকম্।"

পরম্পরাও এখানে সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্র নির্মাণের বিকাশক্রমে Nomadic tribes, settled communities প্রভৃতির যে কথা বলেছেন, ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ, এখানকার জনসমূহ ষড়ঋতুযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে বনজঙ্গলের বিভিন্ন ফলমূল খেয়েই স্থায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে। তাই বাল্মীকি বলেছেন— "ধনেন কিং প্রয়োজনম্ - ফলমূলাশীনং বয়ম্"— তেমনি যুদ্ধ বিগ্রহ, সামাজিক চুক্তি, বিবর্তনাদিও এখানকার জাতীয় বিকাশক্রমের অঙ্গ নয়। রাষ্ট্রীয়তার বিকাশক্রম (Historical course of events) বিষয়ে অথর্ব বেদের মন্ত্রে বলা হয়েছে, "জনং বিভ্রাতি বহুধা বিবাচসমং.... প্রস্ফূরন্তী (১২/১/৪৫) — বিভিন্ন ভাষাভাষী, স্বভাবধর্মী লোককে এই ভূমি ধারণ করে রেখেছে, তারা প্রকৃতি নির্ভর হয়ে বিভিন্নভাবে বসবাস করছিল।" এহেন সমাজের প্রারম্ভিক পরিবর্তন পরিবার সৃষ্টির মাধ্যমে সূচিত হয়— "সা উৎক্রামৎ সা গার্হপত্যে ন্যক্রামৎ"— এবং প্রদীর্ঘকালের প্রয়াসে ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্তন রাষ্ট্ররূপ ধারণ করে— ততো রাষ্ট্রং বলং ওজোশ্চ জাতম্।"

এই রাষ্ট্রীয়তার আধার হলো 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহম্ পৃথিব্যাঃ"। যার সর্বশেষ পরিণতি— 'পৃথিব্যা সমুদ্রপর্বতয়া একরাট্'— অর্থাৎ সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত ভূমি এক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রত্যেকে সজাগ— 'বয়ং রাষ্ট্রে জাগৃহায়াম প্রজাঃ'। ব্যষ্টি, সমষ্টি, সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে সংঘর্ষহীন সমতাপূর্ণ এক সমাজ ব্যবস্থা রচনার জন্য যে কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্মের এখানে প্রবর্তন করা হয়, তা কখনই ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। সময় সময় বিশ্বের নিয়মকে লক্ষ্য রেখে ধর্মের আধারেই সময়ানুকূল সমাজ রচনা এখানে করা হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে এই দেশকে এক বিশিষ্ট ভূখণ্ডের অদিকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে— "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্"— অথবা 'হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দুসরোবরম্' ইত্যাদি। এই ভূমিকে যারা মাতৃভূমি, পুণ্যভূমি, পিতৃভূমি ও আরাধ্য দেবতা বলে মনে করে তারাই হলো এই দেশের রাষ্ট্র বা জাতি। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরাই এই ভাবনাতে ভাবিত হয়ে দেশকে পূজা করে আসছে বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদবাচ্য হয়ে। যার ইতিহাস প্রমাণ করে যে, হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুরাই এই সাংস্কৃতিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, আমাদের অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হবে যে, যখন লোক ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কথা বলে, তখন তার অর্থই হলো যে তারা হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা বলছে। এহেন সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ হাজার বছরের অত্যাচারের শিকার স্বরূপ সোমনাথ প্রভৃতি মন্দিরের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রেরণা নিতে বলেছেন যেগুলি ধবংস হয়েও পুনর্গঠিত হয়েছে এবং জাতীয় জীবনের স্রোত পুনরায় সৃষ্টি করেছে। এলিফিন্টেন অবাক হয়ে বলেছেন যে, হাজার বছরের মুসলমানদের অত্যাচার সহ্য করেও হিন্দুরা ভারতে মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ আজও বিদ্যমান।

বিধর্মীদের শাসনকালে জাতীয় জীবন প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য হাজার হাজার মহাপুরুষ, সাধু-সন্তগণ আত্মত্যাগের ইতিহাস এখানে সৃষ্টি করেছেন। শঙ্করাচার্য থেকে গুরু রামদাস দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন মঠ-মন্দির। ৫২ শক্তিপীঠ, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ সম্বলিত মন্দির সারা দেশে পরিব্যাপ্ত। একাত্ম ভাবনা সৃষ্টিতে মহাকুম্ভের প্রচলন হয়েছে এখানে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থ, পূজাপাঠের মন্ত্র ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুগুলি সারা ভারতকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঐক্যের সংস্কার প্রত্যেকের মনে অঙ্কিত করার জন্য সংকল্প মন্ত্র সংকলিত হয়েছে, যা ভারতের কাল গণনার সঙ্গে যুক্ত— "শ্রীব্রহ্মণে দ্বিতীয় পরার্ধে শ্রীশ্বেত বরাহকল্পে বুদ্ধ অবতারে"— ইত্যাদি।

সমগ্র বিশ্বের মানবকে হিন্দু সংস্কৃতি কখনও বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীতে বিভাজিত করেনি। কারণ এর মান্যতা হলো— ঈশাবাস্যমিদংসর্বম— তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'— যার চিন্তন হল আত্মবৎসর্বভূতেষু— সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। তাই হিন্দুর কাছে বসুধৈবকুটুম্বকম্।"

ইংরেজগণ ও বর্তমানে শাসন ক্ষমতা লোলুপ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং ইংরেজী শিক্ষায় ভাবিত ব্যক্তিগণ এই সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করলেও আজও স্বীকার করতেই হবে ভারত ও হিন্দু সমার্থক শব্দ। হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠতা এবং হিন্দু চিন্তনের অভাব ভারতকে বিভাজিত করেছে ও করছে। হিন্দুত্বকে অস্বীকার করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ভাবনা। ভারতকে অখণ্ড রাখতে হলে হিন্দুত্বকেই স্বীকার করতে হবে, যা হলো আমাদের জাতীয়তার পরিচায়ক। হিন্দুত্বই ভারতের জীবন পদ্ধতি— সুপ্রিম কোর্টও সেজন্য এহেন ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে— "The words Hinduism or Hindutva are not confined only to the strict Hindu religious practices unrelated to the culture and ethos of the people of Indian depecting the way of life of the Indian people..".

সময়ের আহ্বান শুনে গৌরবময় অতীতের ভিত্তিতে আরও গৌরবশালী ভারত তৈরি করার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে এক জীবন্ত সমাজ দেবতার দেদীপ্যমান জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করতে হবে, যার আধার হল হিন্দুত্ব। কারণ 'হিন্দু' শব্দই ভারতের সমস্ত বৈষম্যকে দূর করতে সক্ষম।

ভারতের নবজাগরণের তিন হিন্দু যোগী

ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

স্বামী বিবেকানন্দ, সর্বযুগের সব সাধনা আত্মস্থকারী শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্ররূপে আমেরিকায় বিশ্বধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে সাড়ে সাতশ বছরের পরাধীনতার ঘুম ভাঙ্গিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ, ঊর্ধ হতে উৎসারিত 'অতিমানস শক্তির' অবতরণে পশু-মানবকে দেবত্বদানের অভীপ্সায় জগৎপূজ্য হিন্দু যোগী। ভারতের বিদেশী শাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার বার্তাবহ। ব্রাহ্মবংশে জন্মালেও জীবনসীমান্তে ১৯৩১ সালের আদমসুমারীকালে নিজেকে হিন্দু নামেই পরিচয় দিয়েছিলেন কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ। কাব্যসৃষ্টির ধ্যানযোগে মানবতাবাদী হিন্দু রূপেই তাঁর আত্মপরিচয়।

হিন্দু ধর্ম বহু হাজার বছরের বহু সাধকের মননে দীপ্ত জীবনদায়ী ধারা। ধর্ম—খৃস্টান, ইসলাম, ইহুদী প্রভৃতি ধর্মে একক জনের চিন্তার বাণী ও নির্দেশ বিধৃত। ধর্মগ্রন্থও একটি করে— খৃস্টের বাণীগ্রন্থ 'বাইবেল'। মহম্মদের জীবন-বাণী ও নির্দেশ রয়েছে কোরাণ-হাদিশে। ইহুদী ধর্মগুরু জিহোভার নির্দেশ রয়েছে তালসুদে।

হিন্দু ধারায় রয়েছে আর্যচিন্তার বহুমুখী রূপ। হিন্দু ধর্মের বরিষ্ঠ ভাগ হল — বেদান্ত। ভারতের পুনর্জাগরণ যজ্ঞের ঋত্বিক তিন হিন্দু। এই তিন সেরা হিন্দু হলেন উপনিষদের ধর্মে আস্থাশীল, বৈদান্তিক।

বিবেকানন্দের জন্ম হিন্দু পরিবারে। কৈশোরে কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেছেন। অরবিন্দের বাবা কৃষ্ণধন ঘোষ ও দাদামশাই রাজনারায়ণ বসু উভয়েই আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। ব্রাহ্ম সমাজের কঠোর সমালোচক অরবিন্দ বিবাহ করেছেন স্ববর্ণে, হিন্দু মতে। সাকার নিরাকার নিয়ে বিরোধ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালের আদমসুমারীকালে নিজেকে 'হিন্দু' বলেছেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ হয়েছেন, বিশ্ববিখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী। অরবিন্দ হিন্দুযোগী রূপে জগৎপূজ্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। হিন্দু পরিচয়ে।

সে আমলের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে অরবিন্দ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কোনও শ্রদ্ধা ছিল

না। বরোদা থেকে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ১৮৯৩ সালের ১৩ নভেম্বর অরবিন্দই প্রথম লেখেন, 'ডেমোক্র্যাসি' ও 'সোসালিজম্' ছাড়া মানবমুক্তি সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের জাগরণ ছাড়া উত্থান অসম্ভব। 'প্রলেটারিয়েট' বা সর্বহারা কথাটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর কথা— 'জনসংযোগ' ছাড়া উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের রাজনীতি ব্যর্থ। স্বামী বিবেকানন্দও নিজেকে সোসালিস্ট বলেছিলেন। মুচি, মেথর আমার ভাই, আমার রক্ত বলে ডাক দিয়েছিলেন ভারতের নিপীড়িত জনতাকে। ফলে ভারতের রাজনীতির স্রোত গতিশীল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সরাসরি সমাজতন্ত্রের কথা বলা সম্ভব না হলেও পল্লী সংস্কার ও পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভেবেছেন। তাঁর 'নোবেল' পুরস্কার-এর অর্থ তলিয়ে গেছে পতিসরের কৃষিব্যাঙ্কের গরীব চাষীদের ঋণ দিতে।

সন্ন্যাস সম্পর্কে বিবেকানন্দের সঙ্গে অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কথা— 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। অরবিন্দ সন্ন্যাসের সমর্থক নন। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর ধর্মমতে সন্ন্যাসকে স্বীকৃতি দেননি, সেজন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে ধন্যবাদ দেন। অরবিন্দকে পণ্ডিচেরীতে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অরবিন্দ খৃস্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে জীবনকে রসশূন্য করাকে সার্থকতা বলেননি।' বিবেকানন্দের সঙ্গে এখানেই এঁদের স্পষ্ট পার্থক্য। মারাঠি নেতা রাণাডে সন্ন্যাসকে সমালোচনা করায় বিবেকানন্দ শাণিত যুক্তিতে রাণাডের বক্তব্যকে খণ্ড বিখণ্ড করেছিলেন।

আধুনিক ভারতবর্ষের সেরা মানুষ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে এঁদের মনোভাব স্বতন্ত্র। আর মনীষী রাজনারায়ণ বসু, কবি মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এঁরা তিনজনই কমবেশি শ্রদ্ধালু।

রাজা রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত। 'ভারত পথিক' বলেছেন তাঁকে। বিবেকানন্দ সশ্রদ্ধ ।নতুন ভারতের প্রথম মানুষ বলে অভিহিত করেছেন রামমোহনকে। অরবিন্দ কিন্তু প্রথম জীবনে রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণের চেয়ে ছোট মাপের মানুষ বলে মনে করেছেন। পরে অবশ্য ১৯২৫ সালে রামমোহনকে জাতির জাগরণের পথিকৃৎ বলেছেন।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রাজনারায়ণ বসুকে শ্রদ্ধা করেছেন তিনজনই। রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে রাজনারায়ণের ছাপ পড়েছে। বিবেকানন্দ তো বেশ কয়েকবার গিয়েছেন দেওঘরে রাজনারায়ণকে দেখতে। মাতামহ রাজনারায়ণের প্রতি অরবিন্দের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তাঁর মৃত্যুতে একটা কবিতাও লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকেও শ্রদ্ধা করেছেন তিনজনই। বিবেকানন্দ বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে ঢাকায় বলেছিলেন, "Read Bankimchandra, Bankimchandra & Bankimchandra only" ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অরবিন্দ সাতটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁকে তিনি 'মহাদ্রষ্টা ঋষি' বলে মেনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, — বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য কর্মযোগী। তাঁর হৃৎকমল যে বঙ্কিম-প্রতিভা সূর্যের আলোয় বিকশিত হয়েছিল, তা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে। উপযাচক হয়ে দেখাও করেছেন তাঁর চুঁচুড়ার বাসায় গিয়ে। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে মালা পরিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ের বিয়ের আসরে। বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের জয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম হোতা ও 'বন্দেমাতরম্'-এর ঋষি কেন নীরব হয়ে রইলেন তা আজও জিজ্ঞাসা হয়ে আছে।

শ্রীঅরবিন্দের কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে স্বামীজীর তিরোধানের পর। কাজেই

অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর (বিবেকানন্দের) বক্তব্য আশা করা যায় না। বিশ্বধর্ম সভায় বিবেকানন্দ তথা ভারতের জয়ে অরবিন্দের নীরবতা বিস্ময়কর। তিনি তখন বরোদায় 'ইন্দুপ্রকাশে' রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখছেন (১৮৯৪)।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের গুরু। তাঁর প্রতি স্বামীজী শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। অরবিন্দও রামকৃষ্ণকে 'মনুষ্যদেহী ঈশ্বর' বলেছেন। স্বামীজীর দেশপ্রেম চেতনার মূলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আদি ব্রহ্মসমাজের তরুণ নেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের হোতা রামকৃষ্ণ সম্পর্কে ছিলেন নীরব। তবে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিশ্বকবির কটি পংক্তিকে 'রামকৃষ্ণ জীবন সাধনা' অনবদ্য ভাবে পরিস্ফুট—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা,
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।"

পিতা দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল উচ্চ। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ উভয়েই ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ। বিশ্বধর্ম সভায় বিবেকানন্দের জয়ে আনন্দিত দেবেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলেন। অবশ্য সে পত্র

বিবেকানন্দের জ্ঞাতিশত্রুরা নষ্ট করে ফেলেছিল।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ অল্প বয়সে হয়েছে কিনা তার খবর নেই। তবে ফরাসী মনীষী রোঁমা রোলাঁর ডায়েরীতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার বিলাত যাত্রার সময় সহযাত্রী ছিলেন অরবিন্দ। কথাটা সম্পর্কে সংশয় জাগে, কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়েছিলেন ১৮৭৮ সালে আর সাত বছর বয়সে ১৮৭৯ সালে অরবিন্দ তাঁর বাবার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড যান।

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দর (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) মধ্যে যে দেখাশোনা হয়েছে তার প্রমাণ আছে। রাজনারায়ণ বসুর মেয়ের বিয়েতে রবীন্দ্রনাথের শেখানো গান গেয়েছেন নরেন্দ্রনাথ। কাশীতে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বিবেকানন্দের কণ্ঠে।

বিবেকানন্দের তিরোধানের পর বিভিন্ন জায়গায় লেখায় ও বক্তৃতায় বিবেকানন্দের প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কৌতূহলী পাঠক, সমাজ (পূর্ব-পশ্চিম), রাজাপ্রজা (পথ ও পাথেয়), বঙ্গদর্শন (ভাদ্র, ১৩১৫) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পড়ে দেখতে পারেন। বেঙ্গলীপত্রে (১৫.৭.১৯০২) দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বিবেকানন্দের শোকসভায় পৌরোহিত্য করেন। রবীন্দ্রনাথের 'নিবেদিতা' নিবন্ধে বিবেকানন্দের অনুল্লেখ আশ্চর্য করে। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে সুরকার ও গীতিকার দিলীপ কুমার রায়কে বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দ এদেশে এসে কাঁদুনী গাননি। তিনি ভারতের আত্মার ঐশ্বর্যের কথা বলেছিলেন বলে শ্রদ্ধা পেয়েছেন। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলে ডাক দিয়েছিলেন।

বিশ্বধর্ম সভায় বিবেকানন্দের জয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো স্বদেশপ্রেমী নীরব কেন, তার জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ক'বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' লেখক দীনেশ সেনকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়তে বলেন। বইটির ভাষা ও বক্তব্যের তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। বিবেকানন্দ অবশ্য খোলাখুলি রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করেননি কোথাও। কারণ স্পষ্ট, বিবেকানন্দ যখন বিশ্ববিখ্যাত, রবীন্দ্রনাথ তখন বাঙালী কবি রূপে মাত্র স্বীকৃত।

অরবিন্দ বিবেকানন্দকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁদের দেখা হয়েছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে।

অরবিন্দ বলেছেন, আলিপুর জেলে বিবেকানন্দ এসে তাঁকে যোগশিক্ষা দিয়েছেন। 'অতি মানস শক্তির' কথা বিবেকানন্দের কাছেই শুনেছেন। ১৯০৮ সালের ২ মে থেকে ১৯০৯ সালের ৬ মে পর্যন্ত অরবিন্দ আলিপুর জেলে ছিলেন। কিন্তু তখন বিবেকানন্দ কোথায়? ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তাঁর তিরোধান ঘটে। অরবিন্দকে জেলে যোগশিক্ষা দিয়েছিল বিবেকানন্দের বিদেহী আত্মা। তবে কি মুখোমুখি কোনওদিন এই দুই যুগন্ধর পুরুষের সাক্ষাৎ হয়নি? অথচ তাঁরা প্রায় সমকালের মানুষ। কলকাতায় বিবেকানন্দের আবির্ভাবের (১৮৬৩, ১২ জানুয়ারি) মাত্র ৯ বছর ৭ মাস পরে ১৮৭২ সালের ১৫ আগষ্ট অরবিন্দের আবির্ভাব কলকাতার ১৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের গৃহে। ১৮৭৯ সালে বিবেকানন্দ

(তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছেন, তখন সাত বছরের অরবিন্দকে তাঁর বাবা কৃষ্ণধন ঘোষ বিলাত পাঠাচ্ছেন। বিলাতে ১৪ বছর কাটিয়ে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অরবিন্দ ভারতে ফেরেন। আর বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর ৬-৭ বছর ভারত পরিক্রমা করে বিশ্বধর্ম সভায় যোগ দেবার জন্য ওই ১৮৯৩ সালের ৩১ মে আমেরিকা যাত্রা করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ভারতবর্ষের আর এক বিরাট পুরুষ গান্ধীজীও ওই একই সময়ে ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই থেকে আফ্রিকা যাত্রা করেন। ১৮৯৩ সালটিকে আধুনিক ভারত ইতিহাসের দিকচিহ্ন বলা যায়।

দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু গরমিল থাকলেও এই তিনের লক্ষ্য ছিল এক— শুধু স্বদেশ নয়, দেশ-বিদেশের সকল মানুষের সর্ববন্ধন মুক্তি। এই ত্রয়ীর জীবন সাধনার ধারা মিশেছে মহাভারতীয় ঐতিহ্য চিন্তার মহাসাগরে। এঁদের ত্যাগ ও তপস্যাতেই নব ভারতের উত্থান।

সাড়ে তিন বছর ইউরোপ-আমেরিকায় বেদান্ত ভারত সংস্কৃতি প্রচার করে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিবেকানন্দ ভারতে ফেরেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদায় কাজ করছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার অরবিন্দ কলকাতায় এসেছেন। ফেরার পথে দেওঘরে বৈদ্যনাথধাম ঘুরে যেতেন। কারণ, তাঁর দাদামশায় (মাতামহ) ঋষি রাজনারায়ণ বসু থাকতেন দেওঘরে। অরবিন্দ গভীর শ্রদ্ধা করতেন মাতামহ রাজনারায়ণকে। ভারতে জাতীয়তাবাদ জাগরণের অন্যতম হোতা ছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলার' প্রবর্তন করেন। স্বামী বিবেকানন্দও শ্রদ্ধা করতেন রাজনারায়ণকে। তিনি বেশ কয়েকবার দেওঘর এসেছেন হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা রাজনারায়ণ বসুকে দেখতে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৮৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর দেওঘর থেকে বলরাম বসুকে বিবেকানন্দের পত্র থেকে। তবে ১৮৯৩ সালের মে মাসে আমেরিকা যাত্রার আগে বিবেকানন্দ দেওঘরে এসে থাকলে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব।

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ফেব্রুয়ারি মাসে মাতমহকে দেখতে আসেন। বিবেকানন্দ বরোদায় আমন্ত্রণে যেতে পারেননি নানা কাজের ব্যস্ততায়। অরবিন্দ তখন বরোদায় ছিলেন। ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ আসেন দেওঘর। রাজনারায়ণ বসু তখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। ১৮৯৮ সালে মৃনালিনী বসুকে লেখা এক পত্রে জানা যায়, বিবেকানন্দের রাজনারায়ণ দর্শন কথা।

অরবিন্দ স্থায়ীভাবে কলকাতায় আসেন ১৯০৬ সাল নাগাদ। এই সময়ই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। অরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার। তার প্রমাণ, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'— কবিতায় রয়েছে (১৯০৭)। ১৯২৮ সালে ইউরোপ যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন অরবিন্দ দর্শনে। দিনটা ছিল অরবিন্দের মৌনী দিবস। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় মৌনভঙ্গ করে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন প্রায় বিশ বছর পরে।

রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ দর্শনের পর লেখেন, 'অরবিন্দকে দেখে ভারি ভালো লাগল, বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিকমত পাবার এই উপায়।'

অরবিন্দও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেই স্বদেশী যুগে লিখেছেন, 'Young Bengal gets its ideas, feeling and culture not from schools and college but from Bankim's novels and Rabindra Nath Tagore's poems'। (স্কুল কলেজ নয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কবিতাই বাঙালী তরুণদের প্রেরণা)।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— "Tagore has been a way farer towards the same goal and curs in his own way that is the same thing, the exact stage of advance and putting of the steps are minor matters. His exact position as a poet or a prophet or anything else will be assigned by posterity and we need not be in a haste to anticipate in final verdict"। (যাত্রী আমরা একই পথের, কার অগ্রগতি কতটুকু ধর্তব্য নয়। কবি বা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রূপে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ মহাকালের হাতে। শেষ কথা বলার অধিকার আমাদের নেই)।

দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু গরমিল থাকলেও এই তিনের লক্ষ্য ছিল এক— শুধু স্বদেশ নয়, দেশ-বিদেশের সকল মানুষের সর্ববন্ধন মুক্তি। এই ত্রয়ীর জীবন সাধনার ধারা মিশেছে মহাভারতীয় ঐতিহ্য চিন্তার মহাসাগরে। এঁদের ত্যাগ ও তপস্যাতেই নব ভারতের উত্থান।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব

নিখিলেশ গুহ

দেশপ্রেম একটি মহৎ আবেগ বা ধারণা, যা মানুষকে সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধে দেশবাসীর মঙ্গলকর্মে চালিত করে। ভাষা বা ধর্মের মিল, এক দেশে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে ঐতিহ্যের বন্ধন জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে পুষ্ট করে। এর মধ্যে ধর্মের স্থান বিশেষভাবে বিবেচ্য। কারণ ধর্ম যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপে আবদ্ধ না থেকে অন্তরাত্মা স্পর্শ করে, তখন তা মুক্তির আস্বাদ বয়ে আনে। সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় প্রেরণা তাই বারেবারেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এদেশের উপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই একথা কতদূর সত্য বোঝা যাবে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল হিন্দুরা। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক আগে উপলব্ধি করে, ফলে আধুনিক জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গেও তাদের আগে পরিচিতি ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও প্রাচীন ভারতে চিন্তার ঐশ্বর্য স্মরণ করে সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদেরও যে দেবার কিছু আছে, এই বোধ আধুনিককালে ভারতীয় মনীষীদের সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করেছে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা ছিল বাস্তবে সে চিন্তাকে রূপায়িত করার প্রথম পদক্ষেপ। মিশনারি এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রাচীন সভ্যতাই ছিল আমাদের আশ্রয়স্থল। পাশ্চাত্যে উদার মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের অনেকে প্রাচীন ভারতের সেই চিন্তার মহিমার সামনে নতজানু না হয়ে পারেননি।

লোকমান্য তিলক

ভগিনী নিবেদিতা

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন, সভা-সমিতির সামান্য পরিসর ছেড়ে ভারতের নিজস্ব বিকাশের গতিপথের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যাঁরা প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন, তাঁদের চিন্তা ছিল কতটা ধর্মাশ্রয়ী। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই ধরুন — দেশকে যিনি মাতৃজ্ঞানে প্রথম উপাসনা করতে শেখান। বাহুতে তুমি মা শক্তি / হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি / তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ইতিমধ্যে অবশ্য হিন্দু মেলার সূচনা হয়েছে। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই মেলা অনুষ্ঠিত হোত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এবং এখানেই মাত্র তের বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কবিতা পাঠ করেন। 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে পরে তা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় (মাঘ, ১২৮১)। এটিই কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা। কলকাতার পার্শীবাগান অঞ্চলে হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হতো। স্বদেশী পণ্য প্রদর্শন ও বিপণন এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মেলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৮৭০ সালে 'জাতীয় সভা' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, শুরুর বছরে হিন্দুমেলা 'জাতীয় মেলা' নাম অভিহিত হতো। নামকরণ সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ করা হলে উদ্যোক্তারা জানান, হিন্দুরা যেহেতু স্বতন্ত্র জাতি, সংগঠনের নাম অযৌক্তিক নয়।

১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দের নেতৃত্বে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা উত্তর ভারতে হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। দয়ানন্দ বৈদিক ধর্মকে হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি জ্ঞান করতেন। পুরোহিততন্ত্র এবং মূর্তিপূজার তিনি সমালোচনা করেন। জাতিভেদ প্রথারও তিনি বিরোধী ছিলেন। দয়ানন্দের মতে, এদেশের মুসলমান ও খৃস্টান সম্প্রদায় বস্তুত নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের দ্বারা গঠিত। শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আর্য সমাজ প্রথম থেকে গ্রহণ করে। হিন্দী ভাষা প্রচার এবং গো-রক্ষা আন্দোলন ছিল আর্য সমাজের অপর দুই প্রধান কর্মসূচী। দয়ানন্দের বাণী তাঁর 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মুখ্যত, ধর্ম প্রচারক হলেও দয়ানন্দের বক্তব্যের ফলে হিন্দু ধর্মের প্রতি মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়ে। পাঞ্জাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আর্য সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

মহারাষ্ট্রে ১৮৯০-এর দশকে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল তিলক প্রবর্তিত শিবাজী ও গণপতি উৎসবের মাধ্যমে। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের পিছনে যে কারণগুলি রাণাডে বর্ণনা করেছিলেন তার অন্যতম হল একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রমুখ সন্তদের প্রভাব। রামদাস ছিলেন শিবাজীর গুরু। শিবাজী ও গণপতি উৎসবকে কেন্দ্র করে তিলক মারাঠা জাতিকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্বদেশী যুগে ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত বাংলায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে শিবাজী উৎসব পালিত হয়। কলকাতা শহরে এই রাজ্যে মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও চট্টগ্রামের মতো প্রধানত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলেও শিবাজী উৎসব সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে কলকাতার শিবাজী উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন তিলক। তাঁকে কেন্দ্র করে জনতার মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। উৎসবে হিন্দু নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি আসন গ্রহণ করেছিলেন মৌলবী দেদার বক্স এবং ডঃ গফুরের মতো মুসলিম সমাজের জাতীয় মনোভাবাপন্ন নেতারা। হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ঘটানোর সরকারি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

বাংলা এবং মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের কাছে আনার চেষ্টা এর আগেই শুরু হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে বরোদা রাজ্যের দেওয়ানের কার্যভার গ্রহণ করার পর শ্রীঅরবিন্দ পশ্চিম ভারতের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০২ সালে তাঁর নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), বাংলায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে আসেন। ওই বছর দোলের দিন (৩১ মার্চ, ১৯০২) কলকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'অনুশীলন তত্ত্ব' গ্রন্থে মনুষ্য জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য দেহ, মন ও আত্মার সম্যক বিকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সেই আদর্শ সামনে রেখে এবং তার নামানুসারে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীও বিপ্লবীদের অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামীজীর ভাষণের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের জয়যাত্রা শুরু

''হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।''

-- রবীন্দ্রনাথ

(আত্মপরিচয়)

বলে শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন। দেশের দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বামীজী সকলকে কর্মযজ্ঞে আহ্বান করেছিলেন। জাতিভেদ প্রথার তিনি ছিলেন নির্মম সমালোচক। যুব সমাজের ওপর স্বামীজী বিশেষ ভরসা করতেন। যে কারণে তাঁর জন্মদিন ১৯৮৪ সাল থেকে ভারতে 'যুব দিবস' হিসাবে পালিত হয়। তিনি চেয়েছিলেন সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে উঠুক, যাঁরা দেশ সেবায় নিজেদের নিবেদন করবেন। তাঁর পরিকল্পনা মতো ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই মিশনের সন্ন্যাসীরা সেবাকাজে নিজেদের নিযুক্ত করেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আদর্শ উত্তরসূরী। ১৯০২ সালে স্বামীজীর দেহরক্ষার পর নিবেদিতার অগ্নিময় বাণী যুবসমাজকে বিপ্লবের পথে আরও আকৃষ্ট করে। দেশকে পরাধীনতার শাসনমুক্ত করা এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিভিন্নভাবে তুলে ধরাই ছিল নিবেদিতার জীবনের মূল লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় জাতীয় সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব ছিল পরিব্যাপ্ত। ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ পশ্চিম ভারত ছেড়ে বাংলায় এলে নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। স্বদেশী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ১৯১১ সালে সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অরবিন্দ মনে করতেন, ভারতকে স্বরাজ লাভ করতে হবে শুধু তার নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ ভোগের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর আত্মিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য তিনি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেন।

'বন্দেমাতরম্' লিখিত পতাকা হাতে মাদাম

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এইভাবে উলটিয়ে গেলে আমরা দেখব, ধর্মের প্রভাব কত গভীরভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। ধর্মীয় বোধ আমাদের শুদ্ধ করে, কোনও মহৎ লক্ষ্যে নিজেদের উৎসর্গ করার প্রেরণা দেয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্তান দলের মিলন মন্দিরের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে অরবিন্দ রচনা করেন 'ভবানী মন্দির' নামে বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশনামা। পুলিনবিহারী দাস তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন, ঢাকায় অনুশীলন সমিতির সদস্যদের দীক্ষা দেওয়া হোত শহর থেকে কিছুটা দূরে এক নির্জন কালী মন্দিরে। দীক্ষা দানের প্রক্রিয়াটি পুলিনবিহারী এইভাবে বর্ণনা করেছেন— "দীক্ষা-প্রার্থীগণ এবং আমি, সকলেই পূর্বের দিনে একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করত যথাবিধি 'সংযম' পালন করিয়া দীক্ষার দিনে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া পবিত্রভাবে 'কালী মূর্তি'র সম্মুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া একে একে 'আলীঢ়াসনে' বসাইয়া মস্তকে গীতা রাখিয়া তদুপরি অসি ধারণ করিয়া প্রত্যেককে পূর্বে বর্ণিত প্রতিজ্ঞামন্ত্র পাঠ করাইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইতাম। তৎকালে যথাসম্ভব রুদ্রভাব অবলম্বন করিবার মানসে আমি উত্তরীয়সহ বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে হস্তে বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতাম। প্রত্যেকেই দীক্ষান্তে কালীমূর্তিকে নমস্কার করিয়া আমাকে নমস্কার করিত।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, পুলিনবিহারী ছিলেন ১৯০৭ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সর্বাধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এবং বাংলার বাইরেও সমিতির শাখা বিস্তার হয়েছিল। বিপ্লবী সমিতির গোপনীয়তা রক্ষা করতে অ-হিন্দুদের সমিতির সভ্য করা হোত না। কিন্তু প্রকাশ্য আন্দোলনে মুসলমানদের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। শিবাজী উৎসবের মঞ্চ থেকে বিপিনচন্দ্র পাল সম্রাট আকবরের নামে মুসলমানদের অনুরূপ উৎসবের আয়োজন করার আবেদন জানিয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি শিবাজীর সমদৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রে সরকারের সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদে উৎসাহ যেমন অন্তরায় হয়েছিল, সেইরকম ভুলে গেলে চলবে না মুসলমান ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোনও একটি দেশের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে বাধা আছে। যেহেতু ইসলামের মূল কেন্দ্র এদেশের বাইরে।

একজন সাম্প্রতিক বুদ্ধিজীবীর এবিষয়ে মন্তব্য শোনা যাক, "বিশাল দরিদ্র মুসলিম শ্রেণীর কাছে নেতৃত্ব যেটুকু আছে সেটুকু মুখ্যতই কট্টরপন্থীদের। ওই নেতৃত্ব ধর্মের আত্মা, যুক্তি ও বাস্তবতাকে বর্জন করে নিজেদের সুবিধামতো নিজেদের ভাষায় যেসব ধর্মাদেশ দিচ্ছেন সেসবের সত্য ও সূত্র যাচাই করার উপায় বা ক্ষমতা ওই সাধারণ শ্রেণীর মুসলিমদের নেই।" (দ্রষ্টব্য ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, 'ভারতীয় মুসলমানদের সংকট', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৯, পৃষ্ঠা ১৩০)। মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসার তাই এত জরুরি। বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত এসম্পর্কে যথাযথ উদ্যোগ এখনও গ্রহণ করা হয়নি। ★

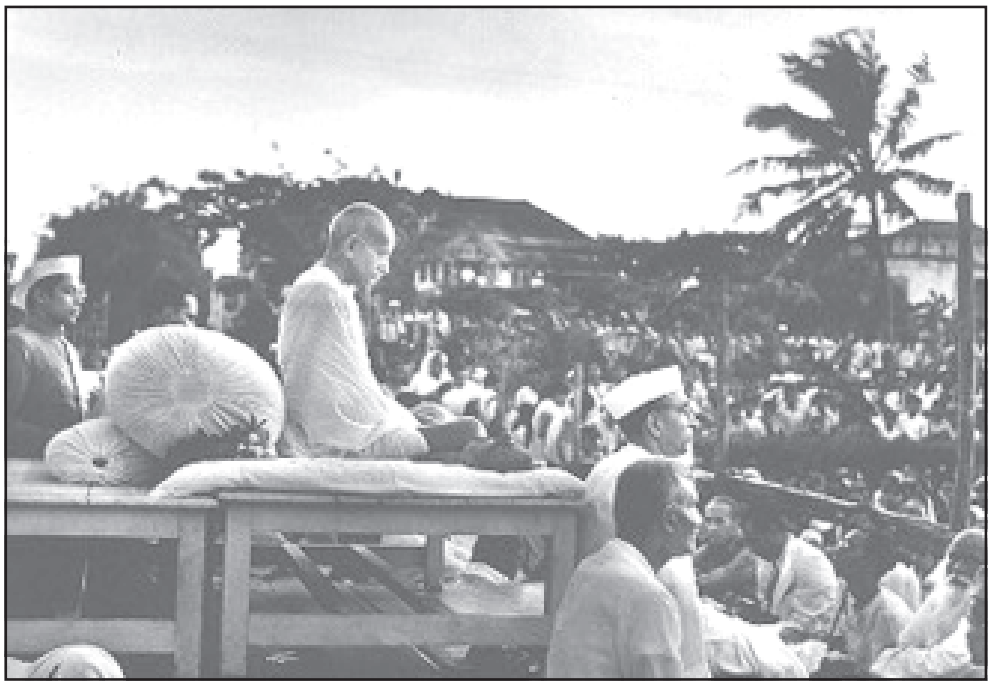

গান্ধীজী ও হিন্দুত্বের আহ্বান

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুত্ব নিয়ে কত যে শোরগোল উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। যারা এইসব শোরগোল তোলেন, আসলে তাঁদের মনে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ব নিয়ে ধ্যানধারণা স্বচ্ছ নয়। অনেকটা বিদেশি লেখক ও ভাষ্যকারদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁরা সহজ বিষয়টিকে জটিল করে তোলেন। ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মতো হিন্দুধর্মে কোনও প্রবর্তক নেই, কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থ নেই। হিন্দুধর্ম সনাতন, শাশ্বত গঙ্গানদীর মতো এর আবহমান স্রোতধারা প্রবাহিত। ভারতবর্ষে যুগে যুগে কত না বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের স্রোত অব্যাহত রয়েছে। সঙ্কীর্ণতার পলি জমলেও স্রোতধারা মজে যায়নি। হিন্দুধর্মের সহজাত অন্তর্নিহিত শক্তি উনিশ শতকের ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় লেখক, চিন্তাবিদ, প্রশাসক ও জাতীয়তাবাদী নেতা রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯০০ সালের জুলাই মাসে The Humanitarian পত্রিকায় Hindu Religion সংক্রান্ত প্রবন্ধে লিখেছিলেন---''The loyality of India to her past is a puzzle to outsiders, the unique phenomenon presented in India of a living stream of ancient faith and traditions flowing from the dawn of history to the prersent time, unbroken by political revolutions and uninterrupted by foreign influences.''

হিন্দু ধর্ম একদিকে যেমন জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছে, অন্যদিকে একের সঙ্গে বহুর মিলনের ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য। ধর্মকে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত করাই

হলো হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের মর্মবাণী। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ফলিত বেদান্তের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মকে মনুষ্যত্বের বিকাশের পাশাপাশি সমাজ ও জাতি গঠনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করতেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda গ্রন্থে স্বামীজী সম্পর্কে লিখেছিলেন ‘‘He spoke of the inclusiveness of his conception of the country and its religions; of his own distinctions as being solely in is desire to make Hinduism active, aggressive, a missionary faith; of 'don't touchism' as the only thing he repudiated.’’

এরপর শ্রী অরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধী হিন্দুধর্ম ও জাতীয় ঐতিহ্যকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ধ্রুবকে পরিণত করেন। অরবিন্দ বুঝেছিলেন ভারতের মুক্তি অর্জন করতে হলে বিদেশি শাসনের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে এবং তার জন্য বিদেশী ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতি বর্জন করতে হবে। তিনি ধর্মকে জাতীয়তাবাদের প্রাণবায়ু বলে অভিহিত করেন। ভারতের প্রকৃত স্বরাজ আনতে হলে বেদান্তের মহান আদর্শকে গ্রোথিত করতে হবে। তিনি আত্মশুদ্ধির ভিত্তিতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতার নীতি ব্যক্ত করেছিলেন। বন্দেমাতরম পত্রিকায় passive resistance প্রবন্ধগুচ্ছে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জাতীয়তাবাদকে ‘অবতার’ বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং ‘ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি’ রূপে অভিহিত করেন। অরবিন্দের ভাবধারার উপর ভিত্তি করেই বাংলার অগ্নি সাধনার সূচনা হয়।

কিন্তু অগ্নি সাধনা শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী দেখলেন নরমপন্থীরা সহযোগিতার পথে আস্থাশীল হয়ে বেশিদূর এগোতে পারেননি। তাদের সঙ্গে জনসমাজের নাড়ির যোগ নেই, আর অন্যদিকে বিপ্লববাদীদের হিংসার পথ ও পন্থা দমননীতির চাপে কার্যত বেহাল। তাই চাই বিকল্প পথ ও পন্থা। গণরাজনীতি ও গণআন্দোলনের পথে এগোতে হবে। কিন্তু কী ভাবে? গান্ধীজী পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী যন্ত্র সভ্যতাকে অভিশাপ বলে মনে করতেন। ১৯০৯ সালে লেখা ড্রন্স্ত ত্রস্ত্রন্দ গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য অমানবিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গান্ধীজীর জন্মভূমি গুজরাটে জৈন ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। এ ছাড়া তাঁর পারিবারিক বৈষ্ণব পরিবেশ, সাধু রাইচাঁদের সংস্পর্শ ও সর্বোপরি ভগবদগীতার অমোঘ বাণী গান্ধীজীকে জাতীয় আন্দোলনে নতুন মাত্রা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি সত্যকে স্বরাজ অর্জনের আধার ও পাথেয় হিসাবে তুলে ধরলেন। গান্ধীজীর মতে কুরুক্ষেত্র আমাদের ভেতরে প্রবিষ্ট, সেখানে সু ও কু প্রকৃতি পাণ্ডব ও কৌরবদের মতো সতত যুযুধান। যুদ্ধে জয়ী হলেই স্বরাজ আসবে তা ঠিক নয়, কেননা স্বরাজ শুধু পরাধীনতা থেকে মুক্তি নয়। স্বরাজ আপন প্রবৃত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণে নিরাসক্ত কর্ম। এতে জয় বা পরাজয় কোনওটাই নেই, আছে নিরন্তর পরীক্ষা;বৃহত্তর সত্যের পথে উত্তরণের প্রয়াস।

নিঃসন্দেহে বলা যায় গান্ধীজী ভারতের দুই প্রাচীন ধর্ম—

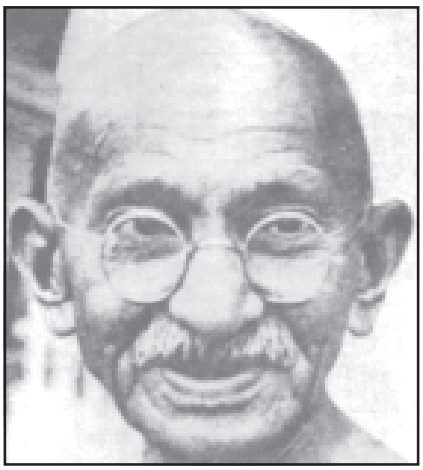

‘‘প্রতিনিয়ত সত্যানুসন্ধানের অপর নাম হলো হিন্দুত্ব।’’

— মহাত্মা গান্ধী

হিন্দুত্বের ভবিষ্যৎ

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে তাঁর চিন্তাভাবনা চয়ন করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ধর্মকে সার্বভৌম শক্তির উৎস বলা হয়েছে। ধর্মের উপরই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত। সত্য ও অহিংসার আদর্শ মহাভারতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সত্য ও অহিংসা একে অন্যের সঙ্গে সংপৃক্ত। সমস্ত বিশ্বজগৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর অহিংসা ব্যতীত সত্য এক অলীক কল্পনা। গান্ধীজীর ভাষায়, “If we have truth in us, it is bound to have its effect, and truth is love, but without love there can be no truth.’’ গান্ধীজী ১৯২২ সালে যমুনালাল বাজাজকে লিখেছিলেন ‘‘As I proceed in my search for truth it grows upon me that truth comprehens everything.’’

তবে গান্ধীজী নিশ্চয়ই সত্য ও অহিংসার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একক সংগ্রামী ছিলেন না, ভারতের জাগ্রত বিবেক স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের আদর্শেই জাতীয় জীবনের রূপান্তরের কথা বলেছিলেন। ১৯০১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনজীবী গান্ধীজী কলকাতায় এসে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যান। অবশ্য স্বামীজী অসুস্থ থাকায় গান্ধীজীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের মেলবন্ধনে গান্ধীজী বিবেকানন্দের ভাবনাকে

বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীকে ভাই বলে কাছে টেনে আনার যে আবেদন স্বামীজী ব্যক্ত করেছিলেন, ''কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত'' হয়ে গান্ধীজী বিবেকানন্দের ভাবনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত হন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা আসমুদ্র হিমাচল পর্যটন করে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ নবভারত গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, গান্ধীজী সেই পথই অনুসরণ করেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''গ্রামের দরিদ্র মানুষের ঘরেই পাওয়া যায় জাতীয় জীবনের স্পন্দন। ঠিক একইভাবে গান্ধীজী বলেছিলেন, ''ভারতের বিশাল প্রাণকে খুঁজতে হলে যেতে হবে তার সাত লক্ষ গ্রামে।''

স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই জীবন ও সমাজের পরমতম সম্পদ। সত্যই ছিল স্বামীজির কাছে প্রকৃত ধর্ম। স্বামীজী স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, ''সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।'' অনুরূপ ভাবে গান্ধীজী সত্যকেই চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সত্যের সন্ধানেই গান্ধীজীর জীবন ছিল সমর্পিত। তাই তিনি বলেছিলেন, ''আমার জীবনই আমার বাণী।'' সত্যের প্রতি প্রাণ-মন সমর্পণ করে দুঃখ কষ্ট দৈন্য সহ্য করার আর ''রাজভয় লোকভয়'' কাটিয়ে ওঠার দিক নির্দেশ করেছিলেন গান্ধীজী। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক ও সামাজিক কোনও মুক্তিই সম্ভব নয়। ধর্মের উপর ভিত্তি করেই অসত্যের বিরুদ্ধে জড়তা কাটিয়ে ওঠে নির্ভীক সংগ্রাম বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রখ্যাত চিন্তানায়ক রোমা রোঁলা সঠিক অর্থেই বলেছেন, ''স্বামী বিবেকানন্দ যে মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, সেই মশালই বহন করে চলেছেন গান্ধীজী।''

আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজী তাঁর লক্ষ্যপূরণে সফল হননি। গান্ধীজী ছিলেন মুক্তি, সংহতির প্রতীক। কিন্তু ভারত বিভাজনের ফলে তাঁর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আর অহিংসার প্রবক্তা দেখলেন স্বাধীনতার ঊষালগ্নে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভারতের রক্তস্নান। এ ছাড়া বিগত ষাট বছরে তাঁর সাধের কংগ্রেস ক্ষমতার রাজনীতির প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হয়ে অসত্য ও অনৈতিকতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, লাগামছাড়া দুর্নীতিকে দেশে পূতিগন্ধময় পরিস্থিতি, গ্রামীণ সমাজ ও কৃষি অর্থনীতির উপর যন্ত্রদানবের তর্জন-গর্জন, সমাজ ও পরিবেশ দুইক্ষেত্রেই দূষণের মাত্রা তুঙ্গে উঠেছে। গ্রামীণ মানুষ এখন অবিচার ও বঞ্চ নার শিকার। সর্বোপরি ভারতের ভেতরে ও বাইরে সন্ত্রাসবাদের চরম দাপট। সত্য ও অহিংসার পরিবর্তে অসত্য, হিংসার, প্রকোপে দেশ ও জাতি আজ অসহায় নীরব দর্শক। কিন্তু এইসব নেতিবাচক প্রবণতা থেকেই বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই সঠিক পথে এগোতে হবে।

জাতীয় জীবনে গান্ধীজীর সত্য, অহিংসা ও নির্ভীকতার আদর্শ এখন চলার পথে দিক নির্দেশ করতে পারে।★

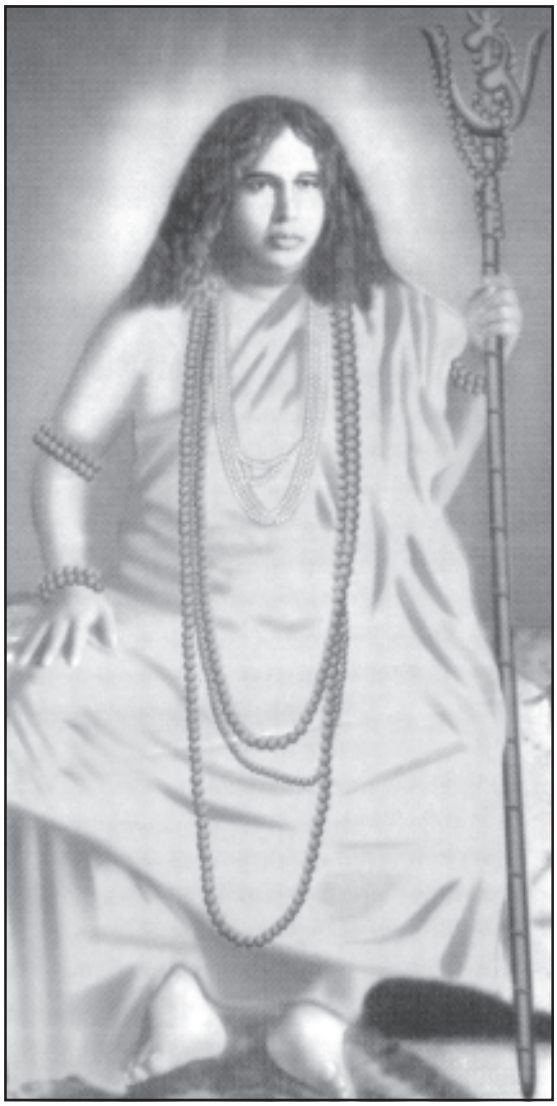

হিন্দুত্ব ও স্বামী প্রণবানন্দ

ডঃ শঙ্কর ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র বাংলায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে যে ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ক্ষমতালোভী বৃটিশের অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভারতবর্ষের মনীষীগণ। স্বধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তৎপর হয়েছিলেন তাঁরা। ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ভারতবর্ষের তাবৎ মহাপুরুষগণ। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধ্যালগ্নে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঐশীপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ আনলেন সমগ্র বিশ্বে যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক বিপ্লব। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুভ্যুদয় সার্থক রূপ নিল। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সময় প্রণবানন্দের বয়স মাত্র ছয় বৎসর।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কৈশোরাবস্থাতেই যুগাচার্য প্রণবানন্দ প্রত্যক্ষ করলেন ক্ষয়িষ্ণু অসহায় জাতির দুর্দশা ও দুর্গতি। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা ভারতবর্ষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের চিরস্থায়ী ঐতিহ্য রক্ষার্থে তিনি আধ্যাত্মিক চেতনায় সমগ্র

জাতিকে উদ্বুদ্ধ করলেন "মহাজাগরণ, মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের" অমোঘ মন্ত্রে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য কৃষ্টিসমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির মূলোৎপাটন কোনও রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক বিবর্তন বা বিপ্লব দ্বারা সম্ভব নয়। যুগাচার্য প্রণবানন্দ তাঁর উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে গঠনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন রাজনৈতিক নেতারা জাতীয়-সংহতি রক্ষার যে সমাধান উপস্থাপিত করেন তা সাময়িক বা ক্ষণভঙ্গুর। ভারতের ইতিহাস তার প্রমাণ। সমুদ্রগুপ্ত, কুমার গুপ্ত প্রমুখ শাসকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তার পরিণাম ছিল সীমিত এবং সাফল্য সাময়িক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্য আসমুদ্র হিমাচল পদব্রজে ভ্রমণ করে বেদান্তবাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার্থে সফল হয়েছিলেন। আচার্য শঙ্করের উত্তরসূরী স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য প্রণবানন্দ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ভারতের সুমহান প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রক্ষার্থে আত্মনিয়োগ করলেন। উভয়েরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে—পাশ্চাত্যের দেশগুলির জীবনীশক্তি যেমন রাজনীতির মধ্যে নিহিত, ভারতবর্ষের জীবনীশক্তি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। জাতিগঠন প্রসঙ্গে আচার্য প্রণবানন্দের বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি বজ্রনির্ঘোষে বললেন, "ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির প্রকৃতিই এমনি যে ধর্মকে ভিত্তি না করলে যথার্থ সমষ্টিজীবন গঠন অসম্ভব। কংগ্রেস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ভারতীয় সমষ্টিজীবন গড়ে তুলতে চায়; আমরা ধর্মকে ভিত্তি করে জাতিগঠন করতে চাই।...

"আমার হিন্দু-জাতিগঠন আন্দোলন তো কংগ্রেসের ভারতীয় মহাজাতিগঠন আন্দোলনের বিরোধী নয়। কংগ্রেস চায়—রাষ্ট্রভিত্তিতে জাতিগঠন, আমিও চাই—ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠন। জাতির জীবনের বহু দিক আছে—ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি। জাতিগঠনের প্রচেষ্টা শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে হলে চলবে না; যুগপৎ ধর্ম, রাষ্ট্র সমাজ সকল ক্ষেত্রে জাতিগঠন আবশ্যক। এ গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত; খৃষ্টানগণও সঙ্ঘবদ্ধ ও সুরক্ষিত—তাদের সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্য কারো মাথা ঘামাবার আবশ্যক হবে না। কিন্তু, জাতির তিন-চতুর্থাংশ যে হিন্দুজনগণ তারাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, বিবদমান, দুর্বল, অরক্ষিত; এই বিরাট ভারতীয় হিন্দু-জনমণ্ডলীকে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে না পারলে জাতীয় জীবন সম্ভব কি?"

যুগগুরু প্রণবানন্দের মতে, ভারতবর্ষে জাতিগঠনের পথে যথার্থ সমস্যা হিন্দু জাতিগঠন, হিন্দু মুসলমান মিলন নয়। বিশৃঙ্খল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই সবচেয়ে বড় কাজ। অসংখ্য ভেদ, বৈষম্য ও বৈচিত্র্যে ভরা হিন্দু জাতিকে সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রতী হলেন প্রণবানন্দ।

জাতির সম্মুখে প্রণবানন্দ তুলে ধরলেন তাঁর সার্বভৌম নীতি—ধর্মপ্রাণতাই ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এই গতিপথ ভ্রষ্ট হ'লেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতির বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘ ও কঠোর সাধনার ফলে যে তপঃশক্তি ও অধ্যাত্মতেজ সঞ্চয় করেছিলেন যুগাচার্য প্রণবানন্দ তা তিনি নিজস্ব পরিতৃপ্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বজনীন উন্নতিকল্পে নিয়োগ করলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধায় আপ্লুত স্মৃতিচারণায় যুগাচার্য প্রণবানন্দের অবদান উল্লিখিত—"আমাদের অধ্যাত্ম উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুগব্যাপী প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতেই আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইবে।...অধ্যাত্মশক্তিকে জনসেবা-কার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া স্বামীজী আমাদের আধি-ব্যাধি-পীড়িত জীবনের অন্ধকার বিচ্ছুরিত করিতে ব্যাপক ও সার্থক প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। নরনারায়ণের সেবা মহৎ কার্য সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাপেক্ষাও মহত্তর কার্য সেবার প্রয়োজনীয়তার নিরাকরণ। আত্মশক্তির উদ্বোধন হইলে মানুষ পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি হইতে চিরন্তন মুক্তি লাভ করে।...তাঁহার হিন্দু মিলনমন্দিরগুলি হিন্দু-সমাজের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চারের জন্য প্রথম বীজারোপণ; এই আদর্শ যদি প্রকৃতভাবে গৃহীত হয়, তবে ইহার মধ্যে মহামহীরুহের সম্ভাবনা নিহিত আছে। আজ চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততার সহিত যে সঙ্ঘবদ্ধ তার আয়োজনে ব্রতী হইয়াছেন, স্বামীজী এক যুগ পূর্বেই সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় সংগঠন কার্যের সূচনা করিয়াছেন। আজ যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সোৎসাহ সমর্থন পান, তবে তাহার কৃতিত্ব অনেকাংশেই স্বামীজীর প্রাপ্য; তিনিই বিচ্ছিন্ন পরমাণু সমূহের ঐক্যবন্ধনের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।" ★

[সৌজন্যে ঃ প্রণব]

''আ-সিন্ধুঃ সিন্ধু পর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।।''

-- বিনায়ক দামোদর সাভারকর, হিন্দুত্ব

হিন্দুর কল্যাণে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

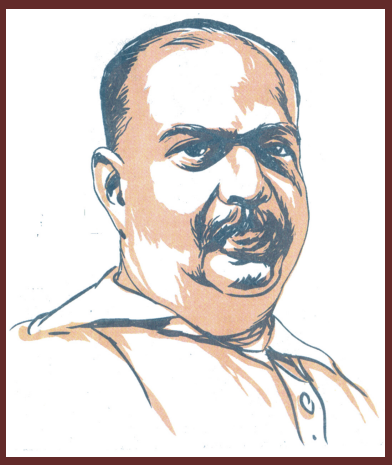

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গদির লোভে চোখ বুজে থাকার পাত্র ছিলেন না। যার হাত থেকে তখনও হাজার হাজার নিরপরাধ হিন্দু নর-নারীর তপ্ত রক্ত টপ-টপ করে ঝরছে, তার সঙ্গে করমর্দন ও চুক্তির স্বাক্ষর করে নেহরু ভাবে গদ গদ হতে পারেন। কিন্তু এমন বিবেকহীন নপুংসক ব্যক্তির অধীনে মন্ত্রীত্ব করা আত্মঅবমাননা মনে করে শ্যামাপ্রসাদ নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে লজ্জা ঘৃণায় পদত্যাগ করেন।

কলকাতা-ভবানীপুরের ৭৭নং রসা রোডের বাড়িটির (বর্তমানে ৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড) শিক্ষা ও আইনের জগতে সর্বভারতীয় পরিচিতি থাকলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। এই বাড়ির মালিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আইনের জগতে দিক্‌পাল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সরস্বতীর বরপুত্রের ভূমিকায় থাকলেও, নিজে যেমন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে ছিলেন শতহস্ত দূরে, তাঁর কৃতী পুত্রদেরও রাজনীতির ঘুর্ণাবর্ত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন— অন্তত ছাত্রজীবনে।

বাড়ির এই চিরাচরিত প্রথায় ভাঙন ধরালেন আশুতোষের মধ্যমপুত্র শ্যামাপ্রসাদ, অবশ্যই আশুতোষের মহাপ্রয়াণের বেশ কয়েক বছর পর। তখন শ্যামাপ্রসাদের বয়স মাত্র ২৩ বছর। এম-এ, এবং ল' পাস করেছেন। তারপর বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারী পাস করে ফিরেছেন। ইতিপূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হয়ে পিতার শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন। কর্মজীবনে নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন— "আমার আকর্ষণ ছিল শিক্ষা-প্রশাসনের দিকে। হৈ-হট্টগোলময় হুজুগে ও মেঠো রাজনীতির প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না।"

কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাবে কে? তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনীতি ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৃটিশের দোয়া ও দয়ায় বাংলার শাসনভার মুসলমানদের করায়ত্ত হল। রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করে তারা কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ পা রাখল এবং অবশেষে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং দখলে হাত বাড়াল। সেখানেই সংঘর্ষ শুরু হলো উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে। ততদিনে ফজলুল হক, সুরাবর্দীর মতো লীগ নেতারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে ঢুকে পড়েছে। এবং প্রশাসন থেকে হিন্দুয়ানী দূরীকরণে কোমর বেঁধেছে।

তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে 'শ্রী ও পদ্মের' মধ্যে পৌত্তলিকতা আবিষ্কার করেছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে বের করেছে। তার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস বয়কট করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমাবর্তন ভাষণ বর্জন করেছে। মাঠে-ময়দানে, আইনসভায় জ্বালাময়ী ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মুসলমানদের জুগুপ্সা জাগিয়ে তুলেছে। তার তোড়ে প্রথম মুসলিম উপাচার্য ডাঃ হাসান সুরাবর্দীকে শ্যামাপ্রসাদ যেভাবে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন, যোগ্য হিন্দু প্রার্থীদের বঞ্চিত করে তার চাচাত ভাই শহীদ সুরাবর্দীকে বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেছেন। ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নিয়েছেন, সব বানের জলে ভেসে গেল। উপরন্তু লীগ প্রশাসন সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে জব্দ করার খেলায় মাতল।

মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর এই হিন্দু বিদ্বেষী চরিত্রের পরিচয় শ্যামাপ্রসাদ

উপাচার্যপদে আসীন থাকাকালেই বারেবারে পেয়েছেন। কিন্তু উপাচার্য হিসাবে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার সুযোগ ছিল না।

বাংলায় তখন রাজনৈতিক দল বলতে দুটি — মুসলমানদের মুসলিম লীগ আর হিন্দুদের কংগ্রেস। কংগ্রেসের সব নেতা হিন্দুদের ভোটেই নির্বাচিত। কিন্তু হিন্দুদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াবার সৎ সাহস তাদের নেই। কংগ্রেস দলের জন্মাবধি যে বৃটিশ-ভজন ও মুসলিম তোষণ চলছে, বাংলার হিন্দুদের তার খেসারত দিতে হয়েছে বারেবারে। হিন্দুদের স্বার্থহানি ঘটলেও তা নিয়ে শরৎ বসু, সুভাষ বসু সমেত কংগ্রেসী নেতাদের প্রতিবাদ জানাতে ভীষণ অনীহা, পাছে কেউ তাদের সাম্প্রদায়িক বলে। সুতরাং নীরবে মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত নিগৃহীত হওয়াই হিন্দুদের ভাগ্যলিপি।

১৯৩৯ সালে এল শ্যামাপ্রসাদের জীবনে এক সন্ধিক্ষণ। যখন বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর পরোক্ষ সমর্থনে মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, পাবনা ও ঢাকায় বিরাট আকারে দাঙ্গা ঘটায় এবং হিন্দু মহিলাদের ওপর ভয়ঙ্কর পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। মুসলমানদের অসন্তুষ্ট করার ভয়ে কংগ্রেস হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী, দাঙ্গাকারী ও নারীদের ওপর অত্যাচারকারীদের নিন্দা করা থেকে সযত্নে বিরত থাকল।

শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দুজন মানুষ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন এবং তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেন। তাঁরা হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর। তাঁরা দু'জনই ছিলেন বিরাট দেশপ্রেমিক এবং দেশের জন্য চরম স্বার্থত্যাগ করেছিলেন। জাতীয় সমস্যাগুলির ব্যাপারে কংগ্রেসের চরম দেউলিয়া নীতিগুলিকে প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত করার অসম সাহস দেখিয়েছিলেন এবং দেশের সামনে হিন্দুত্ব তথা হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণার আধারে এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের কর্মসূচী তুলে ধরেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অন্তর্নিহিত মানসিকতায় সাড়া জাগাল। তিনি কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা, যেমন— স্যার এম এন মুখার্জী, বি সি চ্যাটার্জী, এন কে বসু, এস এন ব্যানার্জী, এন সি চ্যাটার্জী, ময়মনসিংহের মহারাজা প্রমুখ একত্রিত হয়ে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত শ্যামাপ্রসাদ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর স্নেহধন্য ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৪০ সালে জন্মাষ্টমী উৎসবে স্বামীজী শ্যামাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং মঞ্চে সর্বজনসমক্ষে স্বহস্তে স্বীয় কণ্ঠ হতে পুষ্পমাল্য উঠিয়ে শ্যামাপ্রসাদের গলায় দিয়ে বলেছিলেন, "বাঙালী হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিয়ে গেলাম।"

১৯৪০ সালে শ্যামাপ্রসাদ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং ১৯৪০-৪৪ সাল বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এসব পদে তাঁর অবস্থান শুধু

আলঙ্কারিক নয়, বাংলা ও বাংলার বাইরে সারা ভারতে যেখানেই যখন হিন্দু স্বার্থ, হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ হয়েছে, সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সর্বাগ্রগণ্য।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মিঃ জিন্না যখন ভারতভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন, তখন তার বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া আর কেউ-ই প্রতিবাদ করল না। গান্ধীজী ও তাঁর কু-শিষ্য জওহরলাল নেহরু তো মিন্‌মিন্ করে সেদিনই পাকিস্তান ও দেশভাগ প্রায় মেনে নিয়েছেন। কিন্তু গর্জে উঠলেন সদ্য রাজনীতিতে আগত বাঘের বাচ্চা বাঘ শ্যামাপ্রসাদ। এই প্রস্তাব গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে ১৯৪০ সালে ৬-৭ এপ্রিল শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত 'সুরমা ভ্যালী অ্যাণ্ড শিলং হিল ডিস্‌ট্রিক্ট হিন্দু কনফারেন্স'-এ প্রথম সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—

"The danger in front of us are many; the latest addition in the shape of a movement for Pakisthan should not be lightly brushed aside. This preposterous claim must be nipped in the bud by all lovers of Hindusthan"¼

বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ তো আহ্বান জানালেন, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবে কে?

শ্যামাপ্রসাদ লক্ষ্য করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুরা ছাড়া ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের জীবনপণ সহযোগিতা নেই। তিনি মনে করতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই কঠোর সংগ্রাম করে, সর্বস্ব উৎসর্গ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। হিন্দু মহাসভার মধ্যে দিয়ে তিনি সেই সংগ্রামকে কঠোরতর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর ছিল না। তিনি বলতেন, "সংগ্রাম আমরাই করবো, কিন্তু জয়লাভ করলে তার সুফল সকলের সঙ্গে ভাগ করেই ভোগ করবো।" হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন—

"হিন্দু জাতি অমর। বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে তারা তাদের অমূল্য ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছে। আত্মবিস্মৃতির অবসান ঘটলে তাদের শক্তি ও জাতীয় একতার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু এই স্বাধীনতা তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি থাকতে পারে না। দেশের অন্য সকল সম্প্রদায়কে এই স্বাধীনতার অংশভাগী করতে হবে। সংকীর্ণ দলাদলির ভাব, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং দলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আমাদের মন থেকে যেন চিরতরে তিরোহিত হয়।" (হিন্দু মহাসভা সভাপতির অভিভাষণ, বিলাসপুর, ১৯৪৪)।

দুঃখের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন, —

"এই দেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, জাতীয়তা-বিরোধী শক্তিগুলিকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্‌গ্র আকাঙ্ক্ষায় তাহারা সময় সময় এমন বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হয়

তাহা সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে জাতীয় প্রতিরোধ শক্তিকেই দুর্বল করিয়া ফেলে। সেইজন্য এই দেশে এমন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের প্রয়োজন, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুরা যে আদর্শকে জীবন-মরণ প্রশ্ন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যকার শান্তি ও একতা প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসাহ দিবে, অথচ হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার ও আশা আকাঙ্ক্ষার উপর হস্তক্ষেপ হইবার আশঙ্কা

১২ জানুয়ারি ১৯৫০। দমদম বিমানবন্দরে বল্লভভাই প্যাটেলকে স্বাগত জানাচ্ছেন বিধানচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কৈলাশনাথ কাটজু।

দেখা দিলে অথবা রাজনৈতিক সুবিধালাভের মিথ্যা আশায় সেগুলি বলি দিবার উপক্রম ঘটিলে উহা রক্ষা করিবার সাহস ও শক্তি তাহার থাকিবে।''

কিন্তু আত্মশক্তিতে যারা সন্দিহান, অহিংসার চাপাটি ভাঁজতে ভাঁজতে যাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে, সেই কর্তাভজা কংগ্রেসীদের কাছে মুসলিম লীগ ও বৃটিশ সরকারের যৌথ শয়তানির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো চারিত্রিক ও নৈতিক মনোভাব আশা করাই বৃথা। লাহোর প্রস্তাবের ছ'বছরের মধ্যে হিন্দুদের ওপর মধ্যযুগীয় ইসলামী বর্বরতার প্রয়োগ করে মুসলমানরা পুরো বাংলা ও পাঞ্জাব সমেত হিন্দুস্থানের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে পাকিস্তান গড়বার খেলায় মাতল। দিশাহারা কংগ্রেসীরা হিন্দুদের সামনে বাঁচবার কোনও পথই প্রদর্শন করতে পাচ্ছিলেন না। তখন শ্যামাপ্রসাদ 'হিন্দুস্থান ভাগ হলে পাকিস্তানও ভাগ করতে হবে' বলে হিন্দুদের পক্ষ থেকে ডাক দিলেন। তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে হিন্দুরা শ্যামাপ্রসাদের পেছনে দাঁড়াল। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলি পাকিস্তানের কবলস্থ হওয়া থেকে রক্ষা পেল। জিয়াকে পোকাকাটা পাকিস্তান নিয়েই রুষ্ট মনে দিল্লী ছেড়ে করাচি পাড়ি দিতে হল। গান্ধীজীর প্রযোজিত সি আর ফর্মুলাকে রূপদান করলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাংলার হিন্দুরা শ্যামাপ্রসাদের এই অবদান অস্বীকার করলে তা হবে চূড়ান্ত নিমকহারামি।

গান্ধীজীর চাপে নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে স্বাধীনোত্তর প্রথম মন্ত্রিসভায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু স্বস্তি বোধ করেননি। কারণ, এমন একজন হিন্দুত্ববাদী নেতার সাহচর্য তার শরীরে বিছুটির জ্বালা বোধ করাই স্বাভাবিক। তার থেকে মুক্তি পেতে সুযোগও এসে গেল বছর দুয়েকের মধ্যেই।

১৯৫০ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দুদের ওপর গণহত্যা চালানো হল। তাতে এক ধাক্কায় প্রায় ৫০ লক্ষ হিন্দু নরনারী একবস্ত্রে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিল। এই পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা না নিয়ে নেহরুজী চাচারে

বাঁচারে বলে পাক প্রধানমন্ত্রী নরঘাতক লিয়াকত আলি খাঁনের সঙ্গে এক সর্বনাশা চুক্তি করে বসলেন, মন্ত্রিসভার বিনা অনুমোদনেই। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে যা নিমজ্জমান ব্যক্তির মাথায় বাঁশের বাড়ি সদৃশ। বাংলা ভাগকালে পাকিস্তানের হিন্দুদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই চুক্তি তার উপর যেন জুতা প্রহারের সমান। দাঙ্গায় সর্বহারা বরিশালের কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার তার এক কাব্যিক রূপদান দিয়েছিলেন—

"যখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান হল,
নেহরুজী বলেছিল,
পূর্ববঙ্গে হিন্দু আছে যত,
তাদের বিপদে আপদে রক্ষা—
কংগ্রেসের এই ব্রত।
এখন গদিতে ঠেকায়ে পাছা,
কে দেখে কার মরা বাঁচা,
চোখ বুঁজে নেহরু চাচা—
আছেন বক ধার্মিকের মতো।।

কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গদির লোভে চোখ বুজে থাকার পাত্র ছিলেন না। যার হাত থেকে তখনও হাজার হাজার নিরপরাধ হিন্দু নরনারীর তপ্ত রক্ত টপ-টপ করে ঝরছে, তার সঙ্গে করমর্দন ও চুক্তি স্বাক্ষর করে নেহরু ভাবে গদগদ হতে পারেন, কিন্তু এমন বিবেকহীন নপুংসক ব্যক্তির অধীনে মন্ত্রীত্ব করা আত্মঅবমাননা মনে করে শ্যামাপ্রসাদ নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে লজ্জায় ঘৃণায় পদত্যাগ করেন। পার্লামেন্টে তাঁর পদত্যাগের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ সক্ষোভে বলেছিলেন—

"পাকিস্তানের প্রতি আমাদের (ভারত সরকারের) নীতিতে আমি কখনও স্বস্তি অনুভব করিনি। আমাদের নীতি দুর্বল, দ্বিধা জড়িত ও সামঞ্জস্যহীন। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে যেসব ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের পূর্বের দুঃখ কষ্টের কোনও তুলনাই হয় না। শুধু মানবিকতার দিক থেকেই নয়, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বংশানুক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে আত্মত্যাগ করেছেন, যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, তারই ভিত্তিতে তাঁরা স্বাধীন ভারতের ক্রোড়ে আশ্রয় পাবার অধিকারী। দেশের যে নেতারা আজ আর বেঁচে নেই, যে যুবকরা একদিন হাসিমুখে ফাঁসিকাঠ বরণ করেছেন, তাঁরাই স্বাধীন ভারতের কাছে আজ ন্যায় বিচার চাইছেন।"

শ্যামাপ্রসাদ যেমন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে স্বেচ্ছায় লোভনীয় মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাও তাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ও সহানুভূতির কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণে রেখেছে। তার প্রমাণ মেলে ১৯৫০ সালে বরিশালের প্রলয়ঙ্কর দাঙ্গায় সর্বহারা আরেক কবিয়াল হরিচরণ সরকারের রচনায়—

"বাস্তুহারার মনের ব্যথা কে বুঝিয়ে ভাই।
এমন দুঃখের দিনে মোদের শ্যামাপ্রসাদ নাই।।
স্বাধীন রাজ্যে স্বাধীন কার্যে,
বুঝি না আইনের মর্জি,
এমন বান্ধব আর কে আছে—
জানাব দুঃখের আর্জি।
বাস্তুহারার দুঃখ দেখে,
মুখ্য কর্মে লক্ষ্য রেখে,
প্রাণ দিল কাশ্মীরে থেকে—
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।।"

এভাবেই হিন্দুর কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার যবনিকাপাত হলো। ★

১৩ মার্চ, ১৯৫০। শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের ঢল।

দেশভাগ : হিন্দুর যন্ত্রণা

শ্যামলেশ দাশ

ভারত বিভাগ হয়েছে আজ ৬২ বছর হয়ে গেল। ভারত বিভাগের ক্ষত আজও শুকায়নি। ক্ষতের যন্ত্রণা আজও প্রশমিত হয়নি। বিশেষভাবে হিন্দুদের। মুসলমানদের নয় কেন? কারণ মুসলমানদের যন্ত্রণা তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। মুসলমানরা হিন্দু মারতে মারতে পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করে ফেলেছে। ফলে মার দেওয়ার মতো হিন্দু আজ আর পাকিস্তানে নেই। তাই আজ তারা স্বজাতি নিধনে নিজেদের জিঘাংসাকে তৃপ্ত করছেন। আল কায়দার হত্যালীলায় পাক শাসকরা আজ বিপর্যস্ত। মুসলমানদের হাতে মুসলমানরাই খুন হচ্ছে। কথায় বলে 'পাপ বাপকে ছাড়ে না'। পাকিস্তানে আজ এই প্রবাদই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথমেই বলি, পাকিস্তানের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা, বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য এবং পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার

> “আমার কথা বিশ্বাস কর, তখনই – কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন মাত্র ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে।”
> – স্বামী বিবেকানন্দ

অর্থমন্ত্রী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ীর ‘পাক-ভারতের রূপরেখা’ (প্রকাশক ঃ শ্যামা প্রকাশনী, চাকদহ, নদীয়া) পাকিস্তানে হিন্দু যন্ত্রণার এক প্রতীকী ব্যাখ্যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকার প্রসঙ্গে দিয়েছেন। প্রভাস লাহিড়ী দাবী করেছেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকার তাঁর এই প্রতীকী ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেক উদার গণতন্ত্রী মুসলমান নেতাও একমত হয়েছেন। ব্যাখ্যাটি এইরূপ— পাকিস্তানী পতাকার তিনভাগ সবুজ। একভাগ সাদা। তিনভাগ সবুজ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতীক। একভাগ সাদা, সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতীক। এরা পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক— ‘জিম্মি’ বা ‘কাফের’। পতাকার দণ্ডটি সাদা অংশে ঢুকানো রয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুদের পশ্চাদ্‌দেশে বাঁশ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এই পশ্চাদ্‌দেশে ঢুকানো বাঁশ নিয়েই হিন্দুদের পাকিস্তানে থাকতে হবে। এটা প্রভাস লাহিড়ীর মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মতামত। এবার আর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মতামত সংক্ষেপে বিবৃত করি। তিনি হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃটিশ আমলের আই সি এস, হিরন্ময়বাবু বিচার বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি শ্রীহট্টে জেলাজজ ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অধিকতর জনসেবার প্রয়োজনে তাঁকে প্রশাসন বিভাগে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর নির্দেশে হিরন্ময়বাবু জলপাইগুড়ি ডিভিসনের কমিশনার হন। পরে ডাঃ বিধান রায়ের আমলে তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের কমিশনার হন। অবসর গ্রহণের পর হিরন্ময়বাবু ‘উদ্বাস্তু’ নামে একটি তথ্যসমৃদ্ধ স্মৃতিচারণমূলক বই লেখেন (প্রকাশক ঃ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ১৯৭০)। সেই বইতে হিরন্ময়বাবু একটি সাংঘাতিক তথ্য পরিবেশন করেন।

তিনি লিখেছেন, ১৯৪৮ সালে তিনি যখন জলপাইগুড়ি ডিভিসনের কমিশনার ছিলেন, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চললেও পূর্ব পাকিস্তান তখন তুলনামূলক ভাবে শান্ত ছিল। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, দলে দলে উত্তরবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে করছেন। রিলিফের জন্য জেলা প্রশাসনের দপ্তরেও আসছেন। হিরন্ময়বাবু একদিন তাদের কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন তারা এভাবে এখানে চলে আসছেন? ওখানে তো কোনও গণ্ডগোল নেই।’ তখন একজন ভদ্রলোক বললেন, ‘কি করে সেখানে থাকি বলুন!’ ওখানে তার জমি-জমা, ক্ষেত-খামার সবই আছে। স্বচ্ছল ও অবস্থাপন্ন অবস্থা। কিন্তু একটি আপাততুচ্ছ ঘটনায় নিরাপত্তার অভাববোধ করে তিনি চলে এসেছেন। ভদ্রলোকের যুবতী কন্যা পুকুরে স্নান করতে নেমেছে। স্নানরতা সিক্তবসনা ওই যুবতীকে দেখে পুকুরের চারপাশে দণ্ডায়মান নানা বয়সের মুসলমানরা হাততালি দিয়ে সমবেত কণ্ঠে গাইতে থাকে—

‘পাক পাক পাকিস্তান / এখন হিন্দুর ভাতার মুসলমান।’

এই কুৎসিত গানটি শুনে লজ্জায় অপমানে যুবতীটি ঘাটের কাছে এসে বুকজলে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কাঁদতে থাকে। তখন এক প্রৌঢ় মুসলমান পুকুর পাড়ে দাঁড়ানো কয়েকটি যুবককে বলে, ওরে তোদের চাচির পায়ে বোধহয় খিল ধরেছে। যা, তোরা পুকুরে নেমে ওকে বুকে জাপটে ধরে তুলে নিয়ে আয়।’

ভদ্রলোক হিরন্ময়বাবুকে বলেন, বলুন, এরপর কি করে আর পাকিস্তানে থাকি? হিরন্ময়বাবু তাঁর এই বইতে আরও অনেক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতো একজন সুদক্ষ প্রশাসক, শিক্ষাবিদ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের এই অভিজ্ঞতার বিবরণকে কে অস্বীকার করবেন?

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে আমি অসমের শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থান করছি। আমার বয়স তখন সাড়ে দশ বছর। আমার পিতা অধ্যাপক যতীশচন্দ্র দাশ অসম এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। অসমে তখন তিনটি সরকারি কলেজ ছিল। গৌহাটি কটন কলেজ, শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ ও শ্রীহট্ট মহিলা কলেজ। তৃতীয় কলেজটি অনেক পরে (১৯৪৩ সালে) প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার বাবা ওই কলেজে বদলী হয়ে আসেন এবং ১৯৪৯ সালের ৯ জুলাই অবসর গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুস্থানে অপশন নেননি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী আমার পিতা পূর্ববাংলার কোনও প্রাইভেট কলেজে কাজ করে বাকি জীবন কাটাবেন বলে স্থির করেছিলেন। এই বিশ্বাসের চরম মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল। ১৯৫০সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি ও আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (অমরেশ দাশ) দাঙ্গায় শোচনীয় ভাবে নিহত হন। আমার পিতৃহত্যার এক বিবরণ তথাগত রায়ের সুবৃহৎ গ্রন্থ "My People Uprooted" -এ দেওয়া আছে। পূর্ব পাকিস্তানের এই গণহত্যার বিবরণ লুপ্ত হতে বসেছিল। অর্ধ শতাব্দী পরে ২০০০ সালে তথাগত রায়ের অক্লান্ত প্রয়াসে এটি গ্রন্থবদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিশনের কাছেও পৌঁছায়।

এবার ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত শ্রীহট্টের গণভোটের প্রসঙ্গে আসি। বিষয়টি নিয়ে আমি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত আমার বই ‘শ্রীহট্টের গণভোট ঃ ভারত ইতিহাসের কলঙ্ক’, (শ্রীভূমি পাবলিশিং, কলকাতা - ৯) বইতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। ১ন

সংক্ষেপে এইটুকুই বলি যে, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনীয় সমস্ত অসম প্রদেশ হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অসমের বঙ্গ-বিদ্বেষী কংগ্রেস নেতা তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই বাঙ্গালী জেলা শ্রীহট্টকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাবার জন্য মুসলিম লীগকে উস্কানি দেন। এর ফলে শ্রীহট্টে গণভোটের ব্যবস্থা হয় এবং সেই গণভোটেও শ্রীহট্ট জেলার শতাধিক চা বাগানে তিন পুরুষ ধরে কর্মরত প্রায় পাঁচ লক্ষ অ-মুসলমান শ্রমিককে Floating People এই অজুহাতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চি ত করা হয়। প্রশাসন ও লীগের গুণ্ডাদের সাহায্যে ব্যাপক রিগিং ও কারচুপি করে মাত্র ৫৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জেলাটিকে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। গোপীনাথ বরদলুই শ্রীহট্টের জননেতা বসন্ত দাশকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে বসিয়ে রেখেছিলেন। ক্ষমতালোভী বসন্ত দাশ গোপীনাথ বরদলুইয়ের এই চালাকিটা ধরতে পারেননি। ফলে শ্রীহট্টের পাকিস্তানভুক্তির দায়টা শ্রীহট্টের সন্তান বসন্ত দাশের উপরই বর্তায়।

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ সম্বলিত আরেকটি বই ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। বইটির নাম "India Partitioned and Minorities in Pakistan"। বইটিরও লেখক প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী। ভারত সরকার কর্তৃক পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ১৯৬৪ সালে যে কাপুর কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেই কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানকালে প্রভাস লাহিড়ী বইটি কমিশনকে জমা দেন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা জানতে হলে তিনটি বই সবাইকে পড়তে হবে—

(১) পাক ভারতের রূপরেখা। (২) "Partitioned and Minorities in Pakistan" — লেখক প্রভাস লাহিড়ী। (৩) "My People Uprooted" — লেখক তথাগত রায়। প্রথম দুটি বই এখন আর পাওয়া যায় না। তথাগত রায়ের বইটি পাওয়া যায়। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তু' বইটিও পাওয়া যেতে পারে।

আলোচনার আর বিস্তার না ঘটিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর চিন্তাশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। পাকিস্তানের নিম্নকোটির সাধারণ হিন্দুদের হত্যা, অত্যাচার ও বিতাড়নপর্ব শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের মোল্লা মিলিটারির যৌথ লবী পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় হিন্দু নেতাদের ওপর আঘাত হানে। পাকিস্তানের সমর্থক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও দ্বারিকানাথ বাররীকে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এদেশে চলে আসতে হয়। জননেতা সতীন সেন কারাগারে বন্দী অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুধাংশু সাহা আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বসন্ত দাশ আয়ুব খাঁর শাসনকালে EBDO (Election Body's Disqualification Order)-এর শিকার হয়ে এদেশে পালিয়ে এসে কলকাতায় অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। প্রভাস লাহিড়ী রাজশাহী থেকে পালিয়ে মুর্শিদাবাদে এসে ভ্রাতুষ্পুত্রের আশ্রয়ে শেষ জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তান সেন্ট্রাল সার্ভিসের (সি এস পি) সদস্য আমাদের দেশের আই এ এসের সমতুল্য বসন্ত দাশের এক আত্মীয় অজিত দত্তচৌধুরী। তাকে একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলার প্রয়াস আঁচ করতে পেরে তিনি এক বস্ত্রে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন। পরে তিনি ডাঃ বিধান রায়ের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানে মুসলমান নেতারা পাক রাজনীতির উদারীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণে সামান্য সহায়তা করলেই তাদের ওপর পাক রাজনীতির মোল্লা ও মিলিটারি লবির দণ্ডের খাঁড়া নেমে আসত। এদের মধ্যে ফজলুল হক, আতাউর রহমান, আবু হোসেন সরকার, মুজিবর রহমান এবং আরও বহু ছোটবড় মাপের নেতা কারাবাস ও গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন। স্বাধীন বাংলার জন্মদাতা মুজিবর রহমানকেও ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে সীমান্ত গান্ধী নামে খ্যাত হন আবদুল গফ্‌ফর খান ও তার দল 'খুদাই-খিদমৎগার'-এর ওপর পাক শাসকেরা অমানুষিক অত্যাচার করে। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশিষ্ট জননেতা ডাঃ খান সাহেবকেও গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের রক্তদান আন্দোলনের এক প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করে ১৭ ডিসেম্বর মুক্তি দিবসে ঢাকায় ছিলাম। কিন্তু খালেদা জিয়া শাসিত বাংলাদেশে মুজিবর রহমানের কোনও চিহ্নই দেখতে পেলাম না। জানি না, এখন পরিস্থিতিটা বদলেছে কিনা। ২১ ফেব্রুয়ারি চারদিকে গান শুনতে পাই—

''আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো
২১শে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?''

নিশ্চয়ই ভুলতে পারি না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার প্রশ্ন, আমার বাবার রক্তে রাঙানো ১২ই ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?

আজ ৬২ বছর পরে জীবন সায়াহ্নে বসে ভাবি যে, ১৯৫০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় যে ব্যাপক গণহত্যা হলো তার এক হতভাগ্য সাক্ষী আমার মনে প্রশ্ন জাগে, ২১শে ফেব্রুয়ারির মতো ১২ই ফেব্রুয়ারিকেও একটি শহীদ দিবস রূপে চিহ্নিত কি করা যায় না? উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একজন বড় মাপের কমিউনিস্ট নেতা আমাকে বলেন, এটা করার অসুবিধা আছে। কোনও দলের যদি অসুবিধা না থাকে তবে তারা ভেবে দেখতে পারেন।

আমি আমার প্রবন্ধে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রভাস লাহিড়ীর বইয়ের রেফারেন্স দিলাম এই কারণে যে, আমাদের দেশে বেশ কিছু সেকুলার বাতিকগ্রস্ত লোক আছেন। এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গে নির্যাতিত বহু হিন্দুও আছেন। আমি নিজে মুসলিম বিদ্বেষী নই। এটা আমার 'ভারত কেন ভাগ হল' এবং 'ভারত বিভাগ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নেতৃত্ব'— এই বই দুটি পড়ে বহু বিশিষ্ট পাঠক এবং বইয়ের ভূমিকায় একজন কমিউনিস্ট নেতা শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন। কাজেই হিন্দুদের যন্ত্রণার কথা বললেই সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ আরোপিত করা এক ধরনের বিকার ছাড়া আর কিছু নয়। ★

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মহেশ' গল্পে নির্দয় পুরোহিত তর্কালঙ্কার এবং অত্যাচারী হিন্দু জমিদার শিবুবাবুর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছেন গফুরের মুখ দিয়ে বলিয়ে, "আল্লা আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনও মাপ করো না।" এরপরও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কি সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায়? অবশ্যই না। অথচ তিনি তাঁর 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' নিবন্ধে লিখেছেন, "বস্তুত, মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।" এত কঠিন কথা তিনি কেন লিখলেন? আলোচনা প্রয়োজন।

ভারত হিন্দু প্রধান দেশ। হিন্দুপ্রধান হলেও ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ বাস করেন, যেমন মুসলমান, খৃস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি প্রভৃতি। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য এক, ঈশ্বরের কৃপা বা সান্নিধ্য লাভ। উদ্দেশ্য এক হলেও বিভিন্ন ধর্মের, বিশেষ করে হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মীয় বিধান, ধর্মাচরণ, রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, মহাপুরুষগণের বাণী এবং মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র কুরআন শরিফ এবং হাদিস থেকে কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুত্ব বলছে (১) বসুধৈব কুটুম্বকম্। অর্থাৎ পৃথিবীর সকলেই একে অন্যের আত্মীয়। (২) সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। অর্থাৎ জগতে সকলে সুখে থাকুক, সকলে রোগমুক্ত হোক, সকলের জীবন আনন্দে ভরপুর হোক, কেউ যেন দুঃখে না থাকে। (৩) আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ। অর্থাৎ পৃথিবীর সবদিক থেকে সৎ চিন্তা ও সৎ ভাবনা এসে আমাদের সমৃদ্ধ করুক। (৪) শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। অর্থাৎ বিশ্বের সবাই অমৃতের সন্তান — কোনও বৈষম্য নেই। (৫) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। অর্থাৎ সব কিছুতেই ব্রহ্মের প্রকাশ, এর বাইরে কিছু নেই। (৬) ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অর্থাৎ শরীরের বিনাশ হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। (৭) আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। অর্থাৎ (শুধু) নিজেরই মঙ্গল নয়, জগতের মঙ্গলও কাম্য। এ সমস্ত ছাড়াও আছে মহাপুরুষদের বাণী— (১) সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। (২) জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। (৩) যত মত তত পথ। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর লাভ সম্ভব।

এখন দেখা যাক ইসলাম কি বলছে। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরিফ থেকে আমরা পাই, ইসলাম বলছে (১) অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (এখানে অবিশ্বাসীর অর্থ অ-মুসলমান, বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমান, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। — সুরা ৩, আয়াত ১০১)। (২) আর যেখানে পাও তাদের (অমুসলমানদের) হত্যা কর এবং যেখান থেকে তোমাদের বার করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বার করবে। ফিৎনা (ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। (৩) হে বিশ্বাসীগণ (মুসলমানগণ) তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের বিভ্রান্ত করতে দ্বিধা করবে না। যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। (সুরা ৩, আয়াত ১১৮)। (৪) যারা আমার আয়াতে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবোই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে (সুরা ৪, আয়াত ৫৬)। (৫) হে বিশ্বাসীগণ (মুসলমানগণ) অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। (সুরা ৯, আয়াত ১২৩)। (৬) অভিশপ্ত অবস্থায় ওদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। (সুরা ৩৩, আয়াত ৬১)। (৭) পরিণামে আল্লাহ কপট পুরুষ ও কপট নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী নারীকে শাস্তি দেবেন এবং বিশ্বাসী নর এবং বিশ্বাসী নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (সুরা ৩৩, আয়াত ৭৩)। এধরনের আয়াত কুরআন শরিফে অজস্র রয়েছে। আরও উদাহরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

দেখা যাচ্ছে হিন্দুত্ব যখন বলছে, পৃথিবীর সব মানুষই তার আত্মীয়, সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে, পৃথিবীর সকলে যেন সুখে শান্তিতে বাস করে। জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয় ইত্যাদি। অন্যদিকে তখন ইসলাম বলছে, ইসলামই একমাত্র পবিত্র ধর্ম। ইসলাম ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোনও ধর্ম থাকবে না। দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের কাছে আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম করুণাময়। কিন্তু অ-মুসলমানদের কাছে আল্লাহ নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ দানব বিশেষ। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, "মুসলমানরা অপরিণত এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাদের মূলমন্ত্র আল্লাহ এক এবং মহম্মদই একমাত্র রসুল। যা কিছু এর বাইরে সে সমস্ত কেবল খারাপই নয়, সে সমস্ত তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করতে হবে। যে পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী, তাকে নিমেষে হত্যা করতে হবে, যা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাকেই ভেঙ্গে ফেলতে হবে..." ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামের ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত। মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণে যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, প্রত্যেকেই যাতে নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে, কারও প্রতি যাতে কোনও ।

“ হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে। --এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই, তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি.... জগতের অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু।”

-- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৈষম্য না করা হয়, সেজন্য ভারতের সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। সংবিধানের ২৬ নং ধারায় ধর্মীয় সংগঠন এবং ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে দেশের সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু দেখায় অন্য রকম। সংবিধানের ২৭ এবং ২৮ নং ধারায় হিন্দুদের কিছু অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে ৩০ নং ধারা সংযোজন করে মুসলমান, খৃস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্ব-স্ব ধর্মের শিক্ষাদান ও প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধান সংশোধন করে, দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করে দেশের কোনও কোনও সম্প্রদায়কে অধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করেই। ব্যতিক্রমী রাষ্ট্র ভারত। এদেশের রাষ্ট্রনেতারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক তথা হিন্দুদের জন্য ভাবিত নয়। তাদের যত চিন্তা-ভাবনা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা মুসলমানদের জন্য। তারা নাকি দরিদ্র, অনগ্রসর, অবহেলিত, শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চি ত এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু এত কিছুর জন্য দায়ী কে বা কারা, সেকথা অনুচ্চারিত রেখে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয় মুসলিম সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য। যেমন, (ক) ধনী মুসলমান হজযাত্রীদের জন্য সরকারি অনুদান। এবছর সরকারি অনুদান ছিল ৩০০ কোটি টাকারও বেশি। (খ) মসজিদের ইমামদের মাসোহারা কেন্দ্রের অর্থভাণ্ডার থেকে দেওয়া, কিন্তু কোনও দরিদ্র হিন্দু পুরোহিতকে কোনও ভাতা দেওয়া যাবে না। কারণ দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ। (গ) যে সমস্ত এলাকায় শতকরা ২৫ জন মুসলমান বাস করে, সেই সমস্ত এলাকায় পুলিশ, শিক্ষক এবং আরও কিছু চাকরি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। (ঘ) মাসে ২০ হাজার টাকারও বেশি আয় এমন পরিবারেরও মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অর্থাৎ ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি শিক্ষার যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে। এমনকী হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার খরচ পর্যন্ত। (ঙ) ধর্মনিরপেক্ষতার কারণেই একজন মুসলমান একসঙ্গে চারটি বিবি রাখার অধিকারী, যদিও অন্যদের ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। (চ) সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা হয় না। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয় না, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু রাখা হয় সংবিধানের নির্দেশ উপক্ষো করেই। কারণ দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ। এমনকী সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষা করার জন্য সংবিধান সংশোধনও করা হয়ে থাকে। (ছ) মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, যদিও সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলি সরকারি অনুদানের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ নতুন নতুন মাদ্রাসা তৈরি হচ্ছে সরকারি টাকায়। বেআইনী মাদ্রাসাগুলিকে সরকারি অনুদানের আওতায় আনার জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে খরচের জন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেওয়া হয়? কোরান হাদিসের পাঠ এবং আরবি ফারসি ভাষা। এতে করে মসজিদের ইমাম হওয়া যেতে পারে, কিন্তু সরকারি চাকরিতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে সফল হওয়া সম্ভব হবে না। এসব ছাড়াও ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে মুর্শিদাবাদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবে। সবারই জানা আছে, আলিগড়ে তৈরি হয় মজবুত তালা আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গি। এবার থেকে মুর্শিদাবাদে মজবুত তালা তৈরি হোক বা না হোক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি তৈরি হবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব, অপুষ্টি প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের একাধিক বিবাহ বন্ধ করতে হবে। সন্তান সংখ্যা সীমিত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা পরিহার করে চাকরি-কেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি পাকিস্তানপ্রীতি ত্যাগ করে ভারতকে স্বদেশ মনে করে ভালবাসতে হবে।

কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। কারণ, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে হাতিয়ার করে ভারতকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করাই মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্য, সে কংগ্রেস, সি পি এম, তৃণমূল যে দলেরই হোক না কেন।

হিন্দুর বিপদ কোথা থেকে ?

তথাগত রায়

হিন্দুর বিপদ কোথা থেকে?

এর সম্যক উত্তর হতে পারে কোথা থেকে নয়?

একটা ছোট তালিকা দেখা যাক।

প্রথমত, হিন্দুর বিপদ হিন্দুর মূলভূমি ভারতে তাদের ক্রমক্ষীয়মান সংখ্যাতাত্ত্বিক গুরুত্বের দিক থেকে। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে, ১৯৫১ সালের এবং ২০০১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী হিন্দুর ও মুসলিমের অনুপাত ছিল এইরকম—

রাজ্য	হিন্দু		মুসলিম	
	১৯৫১	২০০১	১৯৫১	২০০১
পশ্চিমবঙ্গ	৭৯.৯%	৭৪.২%	১৯.৫%	২৫.২%
অসম	৭৩.৩%	৬৭.২%	২৪.৭%	৩০.৯%
সারা ভারত (শিখ ও জৈন সমেত)	৮৭.৭%	৮৩.৬%	১০.৪৩%	১৩.৪%

এই অনুপাত মুসলিমের সপক্ষে বেড়েছে দুই কারণে। প্রথমত, অতিরিক্ত প্রজনন (যার পিছনে ধর্মীয় প্রেরণা কাজ করে) এবং দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ। এই অনুপাত বৃদ্ধির ফলে পরিণাম যা হতে পারে তার জন্য আমাদের জীবদ্দশার মধ্যে একটু পেছনে তাকালেই হবে। মুসলিম সংখ্যাগুরু পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে এক কোটির ওপর হিন্দু বহিষ্কৃত হয়েছে। আজ সেই অতীত আবার ভবিষ্যৎ হয়ে আসার জন্য দিন গুণছে। যদি না আমরা এবিষয়ে সচেতন হই।

অতিরিক্ত প্রজননের সপক্ষে যে ধর্মীয় প্রেরণা আছে তার জন্য সৈয়দ আবদুল আলা মৌদুদী লিখিত 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ' বইখানি দ্রষ্টব্য। এটির বাংলার ভাষান্তর প্রকাশিত হয়েছে ঢাকায়— আধুনিক প্রকাশনী থেকে। বইটির পাঁচের অধিক সংস্করণ রয়েছে। এবং কলেজ রো-র মল্লিক ব্রাদার্স বইটি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের গুরুদায়িত্ব নিয়েছে।

অনুপ্রবেশের কারণও অতিরিক্ত প্রজনন। এক্ষেত্রে ভারতে নয়, বাংলাদেশে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ, প্রায় ১২০০। তুলনায় ভারতে মাত্র ৩৫০, পশ্চিমবঙ্গে ৭৫০-এর কাছাকাছি। বাংলাদেশের ক্ষমতা নেই এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে চাকরি বা খেতে দেওয়ার। ফলে তাদের ভারতে আগমন।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুর বিপদ ইসলামী মৌলবাদ প্রসূত আতঙ্কবাদ ও নাশকতা থেকে। ইসলামী মৌলবাদীরা বিশ্বাস করে, পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত— দার-উল-ইসলাম (শান্তির দেশ) এবং দার-উল-হারব (যুদ্ধ বিগ্রহের দেশ)। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য, এই বিশ্বাস মতে দার-উল-হারব-কে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। দার-উল-হারব কাকে বলে? যা ইসলামী দেশ নয়, তাকেই বলে। কিভাবে এই পরিবর্তন সম্ভব হবে? জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে। এরই মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত ইসলামে অবিশ্বাসীকে হয় ইসলাম কবুল করতে হবে, না হলে মরতে হবে। এই জেহাদে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের নাম হল মুজাহিদ। এরা জেহাদের পর জীবিত থাকলে 'গাজী' হবে, মারা গেলে 'শহীদ' হবে। এদের জন্য নির্দিষ্ট আছে অনন্ত স্বর্গবাস এবং সেখানে অগণিত 'হুর'-দের সঙ্গে অপরিসীম এবং অচিন্ত্যনীয় সুখদায়ী যৌনক্রিয়া। এইসব হুর-রাও হবে নতনয়না, পরমাসুন্দরী এবং অনন্ত যৌবনের অধিকারিণী।

এই ধরনের মৌলবাদী বিশ্বাসকে ওয়াহাবী বা দেওবন্দী মত বলেও বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় নামটির কারণ হলো, উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ নামক শহরে যে ইসলামী ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে এই মতের চর্চা করা হয়। বোঝাই যাচ্ছে, এই মতাবলম্বীরা সমস্ত অ-মুসলমানকে শত্রু মনে করেন এবং তাদের হয় ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম কবুল করানো, আর না হলে হত্যা করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। এদের কাছ থেকে যে হিন্দুর বিপদ আছে তা বলার প্রয়োজন নেই।

একটা প্রশ্ন থেকে যায়— সব মুসলমানই কি এই মতাবলম্বী? উত্তর, অবশ্যই নয়, হতেই পারে না। কিন্তু সত্য হচ্ছে, যাঁরা এই মতাবলম্বী নন তাঁদের মধ্যে সামান্য দু-একজন বাদ দিলে (যেমন বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিন, লেখক সালাম আজাদ, শাহরিয়ার কবীর প্রমুখ) বাকীরা এর প্রতিবাদ করেন না বা করতে ভয় পান। শুধু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বলতে পারি, সংস্কৃতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ, সাহিত্যিক ও বিশ্বনাগরিক সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রকাশক আবদুল আজীজ আল-আমান, শিক্ষাবিদ রেজাউল করীম, কাজী আবদুল ওদুদ, কবি কাজী

নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক ও আইনজীবী এস ওয়াজেদ আলী, ঐতিহাসিক হোসেনুর রহমান— এঁদের মতো মানুষ জন্মেছেন, যাঁরা সবরকম গোঁড়ামি বিবর্জিত, যাঁদের প্রতিভার কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু এঁরাও কেউ মুখ ফুটে প্রতিবাদটুকু করেন না, নিজেরা মনের দুঃখে গুমরে মরেন। মৌলবাদীদের থেকে শুধু হিন্দুদের বিপদ নয়, এঁদেরও বিপদ।

তৃতীয়ত, হিন্দুর বিপদ 'সেকুলার' হিন্দুর অপপ্রচার থেকে। এইটা বোধহয় সব চেয়ে মারাত্মক।

'সেকুলার' হিন্দুরা জওহরলাল নেহরুর ভাবশিষ্য এবং বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর জীব। এঁদের নামগুলো হিন্দুর মতো, যেমন— জ্যোতি বসু, বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য, মণিশঙ্কর আইয়ার, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, লালুপ্রসাদ যাদব ইত্যাদি। এঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দু ধর্মাচরণও করেন। কিন্তু প্রকাশ্যে এঁরা নিজেদের হিন্দু-ঘৃণাকারী বলে পরিচয় দেন এবং যে প্রচার করেন তার ফলে এদের অনুগামীরাও নিজেদের হিন্দু বলেন না, বলেন 'মানুষ'। এঁদের মধ্যে বহু 'মানুষ' আছেন যাঁদের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) ছিল, বছর বছর অন্ততঃ একবার সেখানে যান কি না জিজ্ঞাসা করলে উস্‌খুস করেন, যেন ছারপোকা কামড়াচ্ছে। বলেন, যাক এসব পুরনো কথা। কিন্তু যদি এসব পুরনো কথা নতুন হয়ে ফিরে আসে? সে সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতেই এঁরা রাজী নন। যে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে ঘুমোনোর ভান করছে তাকে কি করে জাগানো সম্ভব?

এই সব তথাকথিত 'মানুষ'দের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকের এক ধাপ নীচে হচ্ছেন রাজনীতিকরা— যাঁদের চারজনের নাম ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক? সবচেয়ে মারাত্মক 'সেকুলার' সাংবাদিকরা। তাঁরা নিরপেক্ষতার আড়ালে নির্জলা মিথ্যা প্রচার করে যান এবং সাধারণ মানুষ সেই মিথ্যা ছাপার অক্ষরে পড়ে বিশ্বাস করে ফেলেন।

কিছু কাঁচা মিথ্যের উদাহরণ দিই। পশ্চিমবঙ্গে 'বাজারী পত্রিকা' কাকে বলা হয় সবাই জানে। এই পত্রিকার মালিক বাজার-সরকারেরা বিজেপির নিন্দা এবং সোনিয়া গান্ধীর প্রশংসা করাটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে মাঝে মাঝে অতি দুঃখেও হাসি পায়। হাসি পাবার কারণ, এঁদের মাইনে করা 'সাংবাদিক' তকমাধারী চাকরবৃন্দ যা-তা লেখে এবং বিজেপির সম্বন্ধে। কারণ বিজেপিই ভারতে একমাত্র পার্টি যারা বলে এবং বিশ্বাস করে যে হিন্দু অন্যায় করলে যতটা বলা উচিত, মুসলমান অন্যায় করলেও ততটাই বলা উচিত। বাকিরা দ্বিতীয়টা সম্বন্ধে বোবা-কালা, আর সেইটার শোধ নেয় প্রথমটার বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে, রগ ফুলিয়ে। বিশ্বাস হচ্ছে না? গুজরাতে বিজেপির শাসনাধীনকালে কত মুসলমান

"চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে টেলিফোন কেন্দ্রের উল্টোদিকের এই সেই মসজিদ। আগে এখানে একটা ভাঙ্গাচোরা মসজিদ ছিল। এখন উঁচুদরের স্থাপত্যের একটা মসজিদ গড়ে উঠেছে। খরচ অন্তত দশ কোটি টাকা। ...এই টাকা আসছে প্রধানত সৌদি আরব থেকে। সম্ভবত কুয়েত থেকেও।"

"হিন্দু রাষ্ট্রের ইতিহাসগত সঠিক যুক্তিযুক্ত ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই কেবল তথাকথিত 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের' সমস্যার উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তা না হলে তথাকথিত সংখ্যালঘুরা নিজেদের ধর্মের পৃথক খোলসে ক্রমাগতই আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়বে এবং আমাদের সমাজ-দেহে ভয়ানক এক বিচ্ছিন্নতার উৎসে পরিণত হবে।"

— এম এস গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)

মুসলমান মারা গেছে তার কতবার উল্লেখ হয়েছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন, কাশ্মীরে কত হিন্দু মারা গেছে এবং তার কতবার উল্লেখ হয়েছে।

এঁরা দিল্লীতে গোটাকয়েক ডুবন্ত, মরন্ত, হসন্ত ইত্যাদি নামের সাংবাদিক তক্‌মাআঁটা চাকর পুষেছেন। এরা প্রতিদিন দেখতে পায় বিজেপি 'মুখ থুবড়ে পড়ছে'। সেই সঙ্গে নির্বাক, কাঠপুত্তলিকাবৎ কংগ্রেসের বিদেশিনী নেত্রী যদি ডাইনে ফেরেন তাহলে এরা লিখে দেন 'মোক্ষম চাল'। যদি বাঁয়ে ফেরেন তবে লেখে 'মাস্টার স্ট্রোক'। যদি বসেন, তবে 'অসাধারণ রাজনৈতিক বুদ্ধি র পরিচয়'। আর যদি দাঁড়ান তাহলে 'বিজেপির মুখে ঝামা ঘষে দিলেন'। তেল দেওয়া যে কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে সেটা এই ডুবন্ত-মরন্ত গোষ্ঠী দেখিয়ে দিয়েছে।

এবার ইন্দোরে বিজেপির মহাঅধিবেশনে ডুবন্ত-মরন্তকে ঘড়ির কাঁটার মতো হয়ে গেল, কোথাও কোনও হেলদোল নেই। মরন্ত করে কী? মরন্ত লিখল, বিজেপি নেতাদের মধ্যে মহা দ্বন্দ্ব। লিখল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিজেপিকে 'কব্জা' করে নিয়েছে। এবং বিন্দুমাত্র খোঁজ না করে ডাহা মিথ্যা লিখল, সুরেশ সোনী এবং সওদান সিং (?) নাকি বিজেপির সাংগঠনিক মহাসচিব পদে এসেছেন। বেচারা রামলালজী, যিনি সত্যি সত্যি ওই পদে আছেন এবং বাংলা জানেন না, তিনি জানতেও পারলেন না যে মরন্ত তাকে পদচ্যুত করে দিল। ডুবন্ত তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল এবং বাজার-সরকাররা তাই ছেপে দিলেন।

এই 'সেকুলার' রাজনীতিক এবং সাংবাদিকরা হিন্দুদের অন্যতম বিপদ।

চতুর্থ এবং সম্ভবত ভয়াবহতম বিপদ, বুঝতে হলে এই সেকুলারদের এবম্বিধ আচরণের কারণ বুঝতে হবে। তা বুঝতে হলে, একটু চোখকান খোলা রেখে পশ্চিমবাংলার শহর ও প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণ করতে হবে।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে টেলিফোন কেন্দ্রের উল্টোদিকে তাকিয়ে দেখুন। আগে সেখানে একটা ভাঙাচোরা মসজিদ ছিল। সেখানে এখন উঁচুদরের স্থাপত্যের একটা মসজিদ উঠেছে। খরচা অন্তত দশ কোটি টাকা (এই প্রতিবেদক নির্মাণবিদ্যার অধ্যাপকও বটে, এবং একটা বাড়ি দেখে তার খরচ মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে)। হাওড়ার বাঁকড়ায় যান। মসজিদ খরচ ন্যূনতম বিশ কোটি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সরবেড়িয়া। মসজিদ— খরচা অন্তত বিশ কোটি। মুর্শিদাবাদের উমরপুর। মসজিদ ও মাদ্রাসা— পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি খরচ।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে, হতদরিদ্র মুসলিম গ্রামে এই টাকা কোথা থেকে আসছে?

এই টাকা আসছে প্রধানত সৌদি আরব থেকে। সম্ভবত কুয়েত থেকেও। এদের কাছে তেল-বেচা ডলারের মহাসাগর মজুত, সেখানে দশ-বিশ কোটি টাকা খোলামকুচি ছাড়া কিছু নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই টাকা কি শুধু মসজিদ তৈরিতেই যাচ্ছে? আর এদিক-ওদিক কোথাও যাচ্ছেনা তো?

'সেকুলার' রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের পকেটে? (হেঁচকি) বলে বোধহয় অপরাধ করে ফেলেছি!

হিন্দুর আশঙ্কা

অনুপ্রবেশ : পশ্চিমবঙ্গে সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন

বিমল প্রামাণিক

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। বিপুল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সন্নিহিত রাজ্য বা অঞ্চ লগুলি, মূলত মুসলিম অনুপ্রবেশ এবং ইসলামীয় শিক্ষা (মাদ্রাসা)-র প্রচলন ও আধুনিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে উৎসাহদান ও সমর্থন করা হচ্ছে সীমানার ওপার থেকে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ইসলামিক সংগঠনগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে প্রভাব বিস্তার করার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। একইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যশালী বঙ্গীয় সংস্কৃতির মূল ধারাও এরাজ্যে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, বিশেষ করে যারা পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে এদেশে চলে এসেছেন তাদের মধ্যেই এই প্রবণতাটা বেশি করে চোখে পড়ছে। যার নিদারুণ ফলশ্রুতি, বনেদী বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতি, যার মধ্যে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'ও রয়েছে, সেই সঙ্গে লোক-সংস্কৃতিও এখানে ক্রমশ তাদের প্রভাব

হারাচ্ছে। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে এরকম মন্তব্য করলে তা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলিমদের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবোধ শুধুমাত্র প্রকট থেকে প্রকটতরই হচ্ছে না, উপরন্তু তা বাঙালী হিন্দু সমাজেরই অন্তর্গত শহরের বনেদীয়ানা আর গ্রামের মানুষের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা সমীক্ষা করে দেখতেই পারি, গ্রামের মানুষরা কী ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে রয়েছেন, বিশেষত এই রাজ্যে যেসব মুসলমান ও হিন্দুরা সমাজের নীচু স্তরে (আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে) অবস্থান করছেন। তাঁদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বলতে সারা পৃথিবীতে, এমনকী এই উপমহাদেশেও যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ মন্দির, মসজিদ, দরগা, গীর্জার মতো ধর্মীয় স্থান তৈরি করা, এ জিনিসগুলো ওই মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই করে থাকেন। বিগত চার দশক ধরে, ব্যাপক হারে মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে এরাজ্যে মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যাটা রাতারাতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেইসঙ্গে তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কার্যকলাপও অকস্মাৎ খুবই বেড়ে গিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এরাজ্যে মুসলিম মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাও বিচার্য। মুসলিম সমাজেরই একটি উদার অংশ, সুফী-বাউলদের কিছু রীতিনীতি পালনের ক্ষেত্রে নয়া মৌলবাদী মুসলিমরা ফতোয়া জারি করেছে। এমনকী ফতোয়া না মানলে শারীরিক নির্যাতন, আর্থিক জরিমানাসহ বহুবিধ অত্যাচারের ব্যবস্থাও তাদের জন্য রাখা হয়েছে।

এই সমস্ত উদারমনোভাবাপন্ন মুসলিমরা যাতে শ্রমিকের কাজ না পায়, দোকান করতে না পারে, সেচের জল যাতে না পায়, গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত না হতে পারে, খোলা মাঠে উপাসনার জন্য যাতে জমায়েত হতে না পারে— এজন্য তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

এই পর্বের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায় হলো, তাদের সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত গোরস্থানও (কবরখানা) ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। বামপন্থী নেতা-কর্মীরাও সুফী ও বাউল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে কট্টর ইসলামীয় দর্শন প্রবেশ করানোর জন্য এহেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পক্ষপাতী। মজার ব্যাপার, বাংলাদেশে জামাত-এ-ইসলামির আমলে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় থাকা কোনও প্রভাবশালী লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় জন-আদালতের একটা ধারণা আমদানি করা হয়েছে গ্রাম-বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে। এই ব্যাপারে বামপন্থীরা তো বটেই, সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও কট্টর জাতীয়তাবাদীরাও নিশ্চুপ রয়েছেন। তাঁরা সব বিষয় নির্বাচনী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখে মুসলিম সমাজ ক্রমশ তাদের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, এরাজ্যে বিগত চার দশক ধরে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

অন্যদিকে স্বাধীনোত্তর আমলে কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং এরাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে বামপন্থী শাসনে সাংস্কৃতিক প্রচার ও প্রসারকে অবেহলা করার কারণে হিন্দুদের ধর্মীয় সত্ত্বা বেশ লঘু হয়ে গিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী সমাজে মূল ধারার ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। বিগত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সি পি আই (এম) পার্টি ও রাজ্য সরকারের মদতে সংঘটিত বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড, সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু নিধন, কলকাতার বুকে আনন্দমার্গীদের হত্যার ঘটনা এবং সাম্প্রতিককালে নন্দীগ্রাম কাণ্ড ও অন্যান্য শ'য়ে শ'য়ে হত্যালীলা আসলে আইনের শাসনের ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাসটাই নষ্ট করে ফেলেছে এবং বাঙালী সমাজ যে মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়েছিল তাকেও শেষ করে দিয়েছে। বামপন্থী শাসন প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর পরম্পরাগত ধর্মীয় আচরণকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে বাঙালীর নতুন সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিল এবং তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিসাধন হয়ে গেল।

সেই কারণে দুর্গাপুজো বা কালীপুজোর মতো হিন্দু দেব-দেবীর পুজো এখন এরাজ্যে জাঁকজমকপূর্ণ ও জমকালো উৎসবমুখর বিনোদনে পর্যবসিত হয়েছে। সমাজে অর্থনৈতিকভাবে নীচের তলার মানুষ তাঁদের উপাস্য-র পূজা অর্চনার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন রিক্সাস্ট্যাণ্ড, বাসস্ট্যাণ্ড এবং রাস্তার ধারের জায়গাগুলোকে। সেগুলোকে জবরদখল করা হয়েছে বেআইনীভাবে। এবং প্রায়শই তাদের কর্মসংস্থানহীন জীবনে এগুলি অর্থোপার্জনের অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত, এরাজ্যে যে হারে শিল্পতালুক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল, সমানুপাতিক হারে ব্যাঙের ছাতার মতো এইসব পুজোপ্রাঙ্গণগুলো ঠিক সেইসময়েই গড়ে উঠেছিল! পশ্চিমবঙ্গবাসী এই অসহায় অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের মতোই এগুলোকে ভাগ্যের ললাটলিখন বলে মেনে নিয়েছেন। বিগত চার দশক ধরে এভাবেই বাঙালী হিন্দুর মনস্তত্ব তথাকথিত প্রগতিশীলদের প্রভাবে প্রভাবিত একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। পক্ষান্তরে এমন কোনও আন্দোলন এখানে হয়নি যা ভারতীয়ত্বের আধারে বাঙালীর ধর্মীয় রীতিনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এই বিষয়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত হলো 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচীর কথা ব্যাপকহারে প্রচারিত করা। অপারেশন বর্গার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, অন্তত এখন যা অনুভূত হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এটা মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক তৈরির একটা কৌশল ছিল মাত্র। যেহেতু নথিভুক্ত ৬৫ শতাংশ বর্গাদারই হলো মুসলিম, একইভাবে এর মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নয়নের একটা লক্ষ্যও ছিল। যার ফলশ্রুতিতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে মুসলিম উৎসবের সংখ্যা আচমকাই বেশ বেড়ে গেছে এবং ব্যাঙের ছাতার মতো সেসব জায়গায় গজিয়ে উঠেছে মাদ্রাসা ও মসজিদ।

হিন্দু বিদ্বেষে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন

গূঢ়পুরুষ

মুসলিম লীগ এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একযোগে অখণ্ডিত ভারতকে খণ্ডিত করেছিল ধর্মের ভিত্তিতে। তাদের বক্তব্য ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভারতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা নির্যাতিত হবেই। দেশভাগ হয়েছিল মুসলিমদের স্বার্থরক্ষায়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষিত হলেও ভারতের রাষ্ট্রধর্ম হিন্দু সনাতন ধর্ম ঘোষিত হয়নি। স্বাধীন ভারতে হিন্দুর দুর্দশার শুরু ঠিক এই ভুলটি থেকে। সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে এই তথাকথিত 'ভুলটি' জহওরলাল নেহরু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের গিলতে বাধ্য করেছিলেন বামপন্থী সাংবাদিক ও বুদ্ধি জীবীদের প্রচ্ছন্ন মদতে। জওহরলাল সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মালেও নিজেকে লেনিনের কমিউনিস্ট মতাদর্শের শরিক বলে প্রচার করতে পছন্দ করতেন। লেনিনের মতাদর্শের রাষ্ট্রে ধর্মের কোনও স্থান নেই। কমিউনিস্টরা বলে ধর্ম এমন এক আফিম যা বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী সর্বহারাদের শোষণ করতে ব্যবহার করে। জওহরলাল এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দেশের মানুষের মতামতের তোয়াক্কা না করেই ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করেন। জওহরলালের মতাদর্শে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা। জওহরলালের পেটোয়া সুবিধাভোগী বামপন্থী সাংবাদিক বুদ্ধি জীবীরা সুকৌশলে ভারতে মুসলিম স্বার্থরক্ষার জন্যই এমন প্ররোচনা দেয়। জওহরলাল ব্যক্তিগত জীবনে একমাত্র ইংরেজি সংবাদপত্রই পড়তেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লির কংগ্রেসী দৈনিক ন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পাদক বলে নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। চল্লিশ-পঞ্চাশের ভারতের প্রধান তিনটি ইংরেজি সংবাদপত্র, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্থান টাইমস এবং স্টেটসম্যান নীতিগতভাবে বৃটিশ স্বার্থরক্ষাকারী ও হিন্দু বিরোধী ছিল। কারণ, বৃটিশরাজকে ভারতছাড়া করেছিল সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম। মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণভাবে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়নি। সম্প্রতি কয়েকজন বামপন্থী ঐতিহাসিক পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে দাবি করেছেন, বাংলার সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে মুসলমানরাও যোগ দিয়েছিল। অসত্য তথ্য দিয়ে নবীন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করাই বামপন্থী বুদ্ধি জীবীদের একমাত্র ধর্ম। এর বাইরে অন্য কোনও ধর্ম তাঁরা মানেন না। স্বাধীনোত্তর দেশের ইংরেজি সংবাদপত্রের সাংবাদিক-সম্পাদকরা স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু স্বার্থ বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন হিন্দুরাই তাদের প্রভু ইংরেজকে ভারতছাড়া করেছে। তাঁরা দেশভাগের সমর্থন করেছিলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষিত হওয়ায় কোনও অন্যায় দেখেননি তাঁরা। কিন্তু ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণাতে তাঁদের তীব্র আপত্তি ছিল। হতেও দেননি। এই সাংবাদিক-

সংবাদমাধ্যমের ১০টি মন্ত্র

★হিংসা ও সন্ত্রাসের জন্য হিন্দুরাই দায়ী। যেমনটি ম্যাঙ্গালোরে বিয়ার পাবের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল। সেভাবেই হিন্দুদের অপরাধী বলে চিহ্নিত করতে হবে।

★অসত্য জেনেও সব দোষ সঙ্ঘ পরিবারের ওপর চাপাও। যেমন ঝাবুয়া ধর্ষণ কাণ্ড এবং স্কন্ধমালের ঘটনায় করা হয়েছিল। আদালত, তদন্ত কমিশনের রায়কে গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই।

★যখনই দাঙ্গার রিপোর্ট লিখবে তখন কে বা কারা দাঙ্গা শুরু করেছিল লেখার দরকার নেই। সর্বদা মনে রাখবে সংখ্যালঘু মুসলিমরা নিরপরাধ এবং অসহায়।

★জেহাদি জঙ্গিরা হামলা চালালে অবশ্যই লিখবে সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ধর্ম নেই।

★পুলিশের গুলিতে জঙ্গিরা নিহত হলে পুলিশকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করতে হবে।

★ভারতের কোথাও জাতিদাঙ্গা হলে সঙ্ঘ পরিবারকেই দায়ী করতে হবে। তথ্য প্রমাণ ছাড়াই।

★কাশ্মীরে হিন্দুদের গণহত্যার উল্লেখ করা যাবে না। শুধু গুজরাতের দাঙ্গায় হিন্দুরাই প্রধান অপরাধী এমন কথা বারবার লিখতে হবে। প্রয়োজনে কাল্পনিক তথ্যের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন, গোধরা স্টেশনে মুসলিম তরুণীর শ্লীলতাহানি করেছিল করসেবকরা।

★ইসলাম বিরোধী খবর ছাপা হয়েছে এমন অসত্য অভিযোগ সংবাদপত্রের অফিস আক্রান্ত হলে দ্রুত লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রথম পাতায় তা ছাপতে হবে।

★হিন্দুরা নপুংসক। আঘাত করলে প্রত্যাঘাতের ভয় নেই। তাই ভারতমাতা এবং বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে নগ্নরূপে চিত্রিত করার পরেও এন ডি টি ভি হুসেনকে ভারতরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিল।

★সর্বদা মনে রাখতে হবে, লেফট্ ইজ রাইট এবং রাইট ইজ রং। তাই সমস্ত হিন্দুদের গোঁড়া দক্ষিণপন্থী বলে চিহ্নিত করতে হবে। যদিও হিন্দু সনাতন ধর্মে বাম বা দক্ষিণপন্থী বলে কিছু নেই।

বুদ্ধিজীবীদের প্রচারের ঢক্কা-নিনাদে ভারতের রাষ্ট্রধর্ম হয়নি। যা হয়েছে তা আদতে ধর্মহীনতা। এমন আজব তত্ত্বটি সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট শাসনের বাইরের কোনও রাষ্ট্রেই নেই।

স্বাধীন ভারতে হিন্দুর প্রতি অবিচারের সেই শুরু। এই অবিচারে ইন্ধন যুগিয়েছে তথাকথিত ধর্মহীন বামপন্থী সংবাদমাধ্যম। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। স্থানাভাবে শুধু গুজরাতের গোধরা হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করছি। এই কথা বোঝাতে যে বিংশ শতকের হিন্দু বিরোধী সংবাদমাধ্যমের চরিত্রের কোনও পরিবর্তন একবিংশ শতকেও হয়নি। ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একদল সশস্ত্র মুসলিম জনতা গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় আগুন লাগিয়ে ৫৮ জন হিন্দু করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। মৃতদের মধ্যে ২৫ জন মহিলা এবং ১৫ জন শিশু ছিল। পরবর্তীকালে গোধরা তদন্ত কমিশন ২০০৮ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, স্থানীয় দুষ্কৃতী হাসান লালুর নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবেই ট্রেনের কামরায় আগুন লাগানো হয়েছিল। এর জন্য ১৪০ লিটার পেট্রল ব্যবহার করা হয়। এরই প্রতিক্রিয়াতে গুজরাতের কয়েকটি এলাকায় দাঙ্গা হয়।

এমন একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডে যুক্তদের বেকসুর প্রমাণ করতে আমেরিকা ও আরব দেশের টাকায় চলা টিভি চ্যানেল সি এন এন, এন ডি টি ভি, স্টার নিউজ ইত্যাদিরা এবং ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি একযোগে হিন্দুত্ববাদীদের দাঙ্গার জন্য দায়ী করে। গোধরা হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে, ঘটনার পরের দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি সংসদে সাধারণ বাজেট প্রস্তাব ছিল। এডিটর গিল্ড অব ইণ্ডিয়ার বক্তব্য, গোধরা কাণ্ডের থেকে বাজেট রিপোর্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমন কথাও লেখা হয় যে, গোধরা স্টেশনে একটি মুসলিম তরুণীর সঙ্গে করসেবকরা অশ্লীল আচরণ করেছিল। এমন অপপ্রচারে এক নম্বরে ছিলেন বামপন্থী লেখিকা অরুন্ধতী রায়। তিনি গোধরা কাণ্ডের জন্য মুসলমানরা নয়, সঙ্ঘ পরিবারকে দায়ী করেন। তাঁর যুক্তি, অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরদার করতেই করসেবকদের পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাকেশ শর্মা নামে জনৈক স্বঘোষিত তথ্যচিত্র নির্মাতা 'ফাইনাল সলিউশন' নামে গুজরাতে দাঙ্গার ওপর একটি ছবি বানিয়ে ফেললেন। রাকেশের বক্তব্য, গুজরাত থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতেই হিন্দুত্ববাদীরা দাঙ্গা বাধায়। এমন একটি জঘন্য প্ররোচনামূলক তথ্যচিত্রকে ভারতে দেখানো যাবে না বলে ফিল্ম সেন্সার বোর্ড ঘোষণা করে। তাতে কী হয়েছে! রাকেশের ছবি বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ২০০৪-এ দেখানো হয় এবং দুটি পুরস্কারও দেওয়া হয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বলবীর পুঞ্জ সঠিকভাবেই বলেছেন, 'দ্য সেকুলার প্যাক অব জার্নালিস্টস্ অ্যাণ্ড রাইটার্স আর নট ওনলি গিলটি অব প্যারাডিং হাফ ট্রুথ বাট অলসো অব কনডোনিং অ্যাণ্ড ইনসাইটিং ভায়োলেন্স।'

হিন্দুর উদাসীনতা : ধর্মান্তরকরণ

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ ভাগবতে ভারতবর্ষকে বলা হয়েছে বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ 'ভারতাজির'— ভারতমেব অজিরং প্রাঙ্গণং বৈকুণ্ঠস্য। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, — 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী ... কমলা কমলদলবিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িণী.... বন্দেমাতরম্'। বৈকুণ্ঠস্বরূপ ভারতবর্ষের প্রাণ হল বেদাশ্রিত সনাতন বৈদিক ধর্ম, যা বর্তমানে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম। এই ধর্ম উদার, সার্বভৌম এবং সদা লোককল্যাণে ব্রতী। প্রকৃত মানব ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম। তাই দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে (১৯৩৩ খৃঃ) ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী বলেছেন, হিন্দু ধর্ম হলো ভদ্রলোকের ধর্ম (রিলিজিয়ন অফ জেন্টিলম্যান)।

হিন্দুধর্ম কোনও সম্প্রদায় নয়, কিন্তু গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ , জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমষ্টি এবং আশ্রয়স্থল। এই সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির একই লক্ষ্য— 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। নিজের আত্মিক উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ। এই ধর্মের বেদ সমগ্র বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছেন 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা শোন। বিশ্ববাসী সকলের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন— 'সতং বদ, ধর্মং চর'— সত্য কথা বল, ধর্মপথে চল।

তাই আজ সমগ্র বিশ্ব এই সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আমেরিকার চারটি আইনসভায় এই প্রথমবার হিন্দু প্রার্থনা দিয়ে কাজ শুরু হয়। মন্ত্রপাঠ করেন রাজেন জেড, ইউনিভার্সাল সোসাইটি অফ হিন্দুইজমের সভাপতি (দি হিন্দু পত্রিকা)। হিন্দু দেবতা গণেশের পূজাকে কেন্দ্র করে প্যারিসের রাস্তায় দশ হাজারের বেশি জনসাধারণ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এই শোভাযাত্রায় ভারত, শ্রীলঙ্কা ছাড়াও ছিলেন সমগ্র ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার নাগরিকগণ (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া)। এমন বহু ঘটনাই ঘটছে আজ বহির্ভারতে।

কিন্তু প্রদীপের নীচেই যেন অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। ভারতের হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণের প্রকৃত ধর্মবোধের অভাব এবং ধর্মাচরণ ও ধর্মরক্ষার প্রতি চরম উদাসীনতার জন্য হিন্দু জনসাধারণ ঐতিহ্যময় স্বধর্ম ত্যাগ করে নানা কারণে, অনেক সময় বাধ্য হয়ে খৃস্টান ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করছেন। এই ধর্মান্তরকরণ ভারতের একটি জাতীয় সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে খুব কম মানুষই চিন্তা করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, দেশটা ভাগ হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। তার ফলে দুটি ইসলাম রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং ওই দুটি রাষ্ট্রেই হিন্দুরা আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে মান্যতা পেয়ে থাকেন, এমনকী কিছুটা ভয়ের মধ্যেও তাঁদের অবস্থান করতে হয়। তাই জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের আমল থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে এবং কোনও কোনও প্রান্তে আইন প্রণয়নেরও চেষ্টা হয়েছে।

ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে প্রত্যেকে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্ম পালন করুক, কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষকে বলপূর্বক বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা উচিত নয়। তাই শ্রীমদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ" (৩/৩৫)। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ যখন মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে আশ্রম, বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস স্থাপন করেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র ছাত্রাবাস করতে বলেন এবং প্রত্যেককে নিজের ধর্মই আচরণের শিক্ষা দিতে বলেন। বর্তমান ভারতে হিন্দু জনসাধারণ নানাভাবে ধর্মান্তরণের শিকার হচ্ছেন যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রায়ই প্রকাশিত হয়।

খৃস্টান মিশনারীরা ধর্মান্তরকরণের জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, তা হলো — (১) শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের উচ্চশিক্ষা দান বা চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ পদাধিকার প্রদানের প্রলোভন। নাগাল্যাণ্ড অঞ্চল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (২) দরিদ্র বা অনাথ ছোট ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে। এবিষয়ে ব্রাজিলীয় মিশনারী ডিমাস ডিসুজার ঘটনা স্মরণীয় (স্বস্তিকা, ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৯)। (৩) যেসব অঞ্চলে সরকারি পরিষেবা উপযুক্ত নয়, সেখানে পানীয় জল, চাষের বীজ, সার প্রভৃতি প্রদান, বিদ্যালয়, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন এবং বস্তা বস্তা গম, চাল প্রভৃতি প্রদান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখেছি ঝাড়খণ্ডের শিমুলতলা অঞ্চলে। (৪) যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে ধর্মান্তরকরণ। কেরল, দার্জিলিং বা গোয়া প্রভৃতি অঞ্চল এর বিশেষ উদাহরণ।

মুসলমান ধর্মের ক্ষেত্রে বলা যায়— ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে বলপূর্বক এক হাতে কোরাণ ও অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সে পরিস্থিতি নেই। তবে খৃস্টান সম্প্রদায়ের মতো প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে পরিকল্পিতভাবে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এবিষয়ে কেরলে একটি মামলাকে কেন্দ্র করে কেরলের উচ্চ ন্যায়ালয় গত ৯ ডিসেম্বর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে— ''জোর করে ধর্মান্তরকরণ যেটাকে পরিভাষায় 'লাভ জেহাদ' বা 'রোমিও জেহাদ' বলা হচ্ছে, তার বাস্তবতা সরকার কখনওই উপেক্ষা করতে পারে না।''

এভাবে ধর্মান্তরকরণ মুসলমান রাজত্ব, ইংরাজ রাজত্ব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চলছে। হিন্দু সমাজের কাছে এটি এক বিরাট আঘাত বলা যায়। যাঁরা ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, তাঁরা একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্ম-সংস্কৃতির পরম্পরা থেকে শুধুমাত্র দূরে সরে যাচ্ছেন তাই নয়, দেশের প্রতি কর্তব্য থেকেও তাঁরা বিচ্যুত হয়ে যান। যদিও কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব অবশ্যই আছেন।

এখন এর সমাধানের উপায় আমাদের চিন্তা করতে হবে। খৃস্টান বা মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দোষারোপ করার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, শরীর যদি দুর্বল হয় তখন নানা প্রকার ব্যাধি তাকে আশ্রয় করে। হিন্দু সমাজ দুর্বল উদাসীন, তাই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মনে হয় কয়েকটি বিষয়ে হিন্দু সমাজের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে—

(১) বাড়ির ছেলেমেয়েদের ছোট বয়স থেকেই ধর্মাচরণের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের হিন্দু ধর্ম ও ভারতবর্ষের ঐতিহ্য পরম্পরা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া উচিত। (২) সকল হিন্দুর কমপক্ষে রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতা অধ্যয়ন করা উচিত এবং ভগবান রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও গীতার শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করা প্রয়োজন। (৩) ভারতের ঋষি-মুনিরা সমগ্র হিন্দু সমাজকে এক আদর্শের মধ্যে ধরে রাখার জন্যই জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি, দীপাবলী, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, মকর সংক্রান্তি, কুম্ভমেলা প্রভৃতি বারব্রত ও স্নানাদির ব্যবস্থা করে গেছেন। একই দিনে ভারতের লক্ষ লক্ষ হিন্দু জনসাধারণ এগুলি পালন করেন এবং স্নানাদি সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক হিন্দুর উচিত, জাতীয় সংহতির জন্য এই ব্রত-উপবাস এবং স্নানাদিতে অংশগ্রহণ করা। (৪) আচার্য পুরুষগণ চারধাম তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই উত্তরে কেদার-বদ্রীনাথ, দক্ষিণে রামেশ্বরম্, পূর্বে জগন্নাথধাম, পশ্চিমে দ্বারকাধাম দর্শন উপলক্ষে তীর্থভ্রমণ তথা ভারতভ্রমণ করা সকল হিন্দুর ধর্মীয় কর্তব্য। এর দ্বারা ধর্ম ও দেশের প্রতি স্বাভিমানবোধ জাগ্রত হয়। (৫) প্রত্যেক বাড়িতে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, দুর্গা, শিব প্রভৃতি এবং যাঁর যাঁকে ভালো লাগে এমন মহাপুরুষদের ছবি রাখা উচিত। অবশ্যই বাড়িতে তুলসী গাছ রোপণ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে গৃহে তৈরি হয় ধর্মীয় পরিমণ্ডল। এক কথা বলা যায়, হিন্দুয়ানীকে বজায় রাখা সকল হিন্দুরই কর্তব্য। (৬) শুধু ধর্মাচরণ নয়, প্রত্যেক হিন্দুর নিজের ধর্ম ও পবিত্র ধর্মস্থানগুলিকে রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। (৭) ধর্মাচার্যরা বলেছেন, 'ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ'— হিন্দু কোনওদিন পতিত হয় না। ধর্মান্তরিত হলেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে হিন্দুই থাকে। তাই যেসব ধর্মান্তরিত হিন্দু স্বধর্মে ফিরে আসতে চান তাঁদের পরাবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, আর্য সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন। (৮) যেসব খৃস্টান এবং মুসলমান ব্যক্তিগণ চিন্তাশীল, পরধর্মসহিষ্ণু, জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে আগ্রহী, তাঁদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বরিষ্ঠ ব্যক্তিগণের উচিত মাঝে মাঝে আলোচনায় বসা। যেমন লালকৃষ্ণ আদবানীজী ওড়িশার কন্ধমালের ঘটনার পর খৃস্টান পাদ্রিদের সঙ্গে দিল্লিতে আলোচনা করেছিলেন এবং মোহন ভাগবতজী মুসলমান ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সুযোগ পেলে আলোচনা করেন। একথা তিনি পশ্চিমবঙ্গের ধর্মাচার্য বৈঠকে জানিয়েছিলেন, আলোচনা প্রসঙ্গে। এভাবে আলোচনার দ্বারা উক্ত ধর্মগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের সম্পর্ক ভাল হয়ে ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। (৯) পরিশেষে হিন্দু ধর্মাচার্যগণের প্রতি আবেদন, দীক্ষা প্রদান এবং সৎসঙ্গ ও পাঠ-প্রবচনের সময় প্রসঙ্গক্রমে ভক্তদের মধ্যে স্বধর্ম ও স্বদেশের প্রতি স্বাভিমানবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে ভিত্তির উপর রাষ্ট্রীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং ফল দাঁড়াইবে সম্পূর্ণ ধ্বংস। ★

''একটি সাধারণ দেওয়ানী বিধিই পারে জাতীয় অখণ্ডতাকে টিকিয়ে রাখতে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার নাগরিকদের জন্য 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' প্রণয়ন করা এবং অবশ্যই তার দায়িত্ব বর্তায় জনপ্রতিনিধিদের ওপর।''

— সুপ্রীম কোর্ট

প্রসঙ্গ : অভিন্ন দেওয়ানী বিধি

ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে হিন্দু ও হিন্দুত্ব

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কিছুকাল আগে একটা বড় সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধে ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতার উপর দাঁড়াইয়াই হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে।'

এটুকু পড়েই চমকে গিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম যে, নিবন্ধটার লেখক 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'হিন্দুত্ব' — এই দুটো শব্দের অর্থই জানেন না। হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই কেন? আর ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে হিন্দুত্ব বলে কিছু নেই? যদি বলা হোত, উগ্র হিন্দুত্বের বিরোধিতা করতে হবে, তাহলে তার একটা অর্থ থাকত। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর থেকেই হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটা কেমন ব্যাপার?

অবশ্যই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটা আনা হয়েছে ইংরেজি 'সেকুলার' শব্দটা থেকে। যদিও ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার নিরীখে শব্দ চয়নটা একেবারেই ভ্রম ও কদর্থক।

ইংরেজি 'সেকুলার' কথাটা এসেছে মধ্য যুগের ইতিহাসের একটা সঙ্কটময় পটভূমিতে। সেই যুগে রাষ্ট্রীয় জীবনেও ছিল ধর্ম এবং যাজক-প্রাধান্য।

জার্মানীতে মার্কিন লুথার এবং ফ্রান্সে কাল্‌ভিসের নেতৃত্বে যে 'রিফরমেশন' আন্দোলন দেখা গিয়েছে মধ্যযুগের শেষে, তার ফলে পোপের প্রাধান্য খর্ব হয়ে যায়, ধর্মজগৎ যাজকদের হাতে থাকলেও রাষ্ট্রীয় জীবন চলে আসে রাজার হাতে। বৃটেনেও রাজা ব্যক্তিগত কারণে পোপের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করেন। এভাবে যা ছিল "doctrine of two swords", তার অবসান ঘটে। ধর্মীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পৃথক হয়ে যায়। ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যগুলো রাজনীতি নির্ভর হয়ে ওঠে। এটাই — সেকুলারিজম (সীতারাম গোয়েল, সেকুলারিজম্ দেশদ্রোহের অপর নাম, অনুঃ সুহাস মজুমদার, পৃঃ ২০)।

ভারতের ক্ষেত্রে এই অর্থটা কিন্তু বদলে গেছে। আমাদের সংবিধান প্রথমে শব্দটা প্রয়োগ করেনি, কিন্তু গণপরিষদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রচয়িতারা এই কথাটা একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাঁরা চেয়েছেন, ভারত হবে 'সেকুলার' (১) রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে না, (২) কোনও বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না, (৩) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে না এবং (৪) সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রশ্ন তুলে কোনও পক্ষপাতিত্ব করা হবে না (ডঃ এম ভি নাইলী, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য কন্সটিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১২৩)। আর ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সবাইকে দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতা। ডঃ জে সি জোহারীর মতে, এটাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করেছে "constitutes the sheet anchor of secular state" (ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৪৫১)।

সুতরাং বলা যায়, ইউরোপীয় 'সেকুলারিজম্' আমাদের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এক জিনিস নয়। ইউরোপে এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনে যাজকদের প্রভাব কমিয়ে রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষতা ভাবে এর অনুদিত শব্দ হিসেবে গৃহীত হলেও এর দ্বারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে। ব্যক্তি যে কোনও ধর্মমত গ্রহণ ও প্রচার করতে পারেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারেন এবং অপ্রয়োজনীয় সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। দুর্গাদাস বসুর মতে, ব্যক্তি ও ব্যক্তির সম্পর্কটা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ব্যক্তি ও তার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা রাজনীতির বাইরের ব্যাপার (ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্সটিটিউশান অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১০৩)।

তাহলে এই ধর্মনিরপেক্ষতায় হিন্দুত্বের কোনও স্থান নেই? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সব ধর্ম থাকবে, শুধু নিষিদ্ধ হবে হিন্দু ধর্ম?

আরও একটা কথা আছে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটা ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে বেমানান। 'রিলিজিয়ান' কথাটা 'ধর্ম' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও

সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এটা যথার্থ অনুবাদ নয়। 'রিলিজিয়ান' হলো পুজো-পদ্ধতি বা একটা বিশেষ ধরনের ধর্মাচরণ। কিন্তু ভারতে এটা হলো 'ধর্ম'— এর অর্থ ন্যায়, সততা, বিবেকবোধ। গীতার শুরুতে আছে, 'কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে...।' এক্ষেত্রে 'ধর্ম' কোনও পুজো পদ্ধতি বা ধর্ম প্রক্রিয়া নয়, এটা ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। মহাভারতে আছে, দুর্যোধন যুদ্ধে যাওয়ার আগে মাতা গান্ধারীকে বলতেন, যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে আশীর্বাদ করার জন্য। গান্ধারী কিন্তু বলতেন, 'যতোধর্ম স্ততো জয়' ঃ ধর্ম যেদিকে, জয় হবে তারই। এটা বিশেষ কোনও ধর্ম নয়, সত্য, ন্যায় ও বিবেকের জয়বাণী।

এই 'ধর্ম' সম্বন্ধে কোনও সভ্য রাষ্ট্র নিরেপক্ষ বা উদাসীন হতে পারে? তার প্রধান কর্তব্যই তো হবে ন্যায় বা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা। ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের সকল জিনিসের মূলে ধর্ম। ভারতবর্ষে রাজা ধর্মার্থ ফলের নিমিত্ত। ভারতবর্ষের ধর্মই শিক্ষা দিয়েছে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জন্মের সার্থকতা। ভারতবর্ষ তার ব্রহ্মের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের মতো পরস্পরবিরোধী সত্যের অপূর্ব মিলন সাধন করেছে। শরতের আকাশ যেমন 'কলহংস ধবল', ভারতবর্ষের ধর্মে ইতিহাসও তেমনি পবিত্র ও মহিমাময়'— (প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ৪১)।

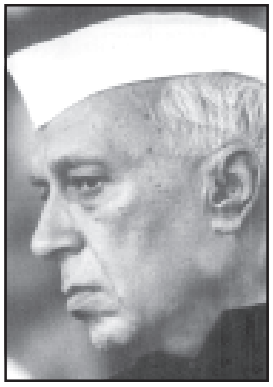

নেহ(

মনমোহন

এবার 'হিন্দু' নিয়ে দু-একটা কথা বলি। কেউ কেউ মনে করেন, আর্য জাতির একটা শাখা খৃষ্টপূর্ব ১০০ সালের আগে এই দেশে এসেছিল— প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ জি ওয়েলস্ এই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন। অথচ অন্য অনেকে মনে করেন, যেমন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ঊষারঞ্জন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, 'ভারতীয় বলতে হিন্দুকে বোঝাবেই, কারণ প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকে তো জীবনধারা প্রবাহিত হচ্ছে একটা দেশের মধ্যে দিয়ে, তার নানা রূপ বিবর্তন সংযোজন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আসতে আসতে জাতিসত্তার সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতিসত্তাই 'হিন্দু' নামে পরিচিত। এজন্য ভারতের অপর নাম 'হিন্দুস্থান'। ভারতের পর্বতের নাম 'হিন্দুকুশ', ভারতের সমুদ্রের নাম 'হিন্দু মহাসাগর' এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় চেতনার অভিবাদনসূচক শব্দ 'জয় হিন্দ্'। অতএব হিন্দুকে বাদ দিয়ে ভারতীয় জাতি বলে কিছু থাকতে পারে না।' (প্রসঙ্গ গণতন্ত্র, রাজনীতি ও ধর্ম, পৃঃ ৩৯)।

এই কারণেই বলা যায়, 'হিন্দু' কথাটার দ্বারা শুধু একটা ধর্মকে বোঝায় না, এর দ্বারা জাতিসত্তা, বিশেষ দর্শন, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও জীবনধারাকেও চিহ্নিত করা উচিত। ১৯৯৫ সালের ১১ ডিসেম্বর তাই একটা রায়ে আমাদের সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছিল, "Hinduism is understood as a way of life or a state of mind and not to be equated with or understood as religious fundamentalism"। এর মধ্যে আস্তিক্য, নাস্তিক্য তো বটেই সেই সঙ্গে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বাউল, আউল, তান্ত্রিকতা ইত্যাদি বহু মতের সমন্বয় আছে, এমনকী বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি ধর্মমতও মিশে গেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে এর সংঘাত হয় কেমন করে? কিন্তু বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কিছু সুবিধাবাদী নেতা ও বিশেষ অজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করেছেন। ডঃ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'মুসকিল হলো, বর্তমানকালের রাজনীতিকদের তথা বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে 'হিন্দু' শব্দটা উচ্চারিত হলেই তাঁরা আতঙ্কিত হন' (ঐ, পৃঃ ৩৯)। অনুরূপভাবে ডঃ এস এন সিক্রি লিখেছেন, "By and large, a Hindu is today accepted as secular only if he is pro-Muslim, and perhaps pro-other minorities" (ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃঃ ২৯৩)। এই কারণে হিন্দুধর্ম বা হিন্দু আবেগকে আঘাত করাটা এখন প্রগতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্য করুন, মকবুল ফিদা হুসেন জননী সরস্বতী বা ভারতমাতাকে নগ্ন করে আঁকলে সেটা শিল্পীর স্বাধীনতা বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু তসলিমা নাসরিন তাঁর বিশ্বাসকে ব্যক্ত করলে তাঁকে 'প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ' বাম সরকার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে এবং বুদ্ধিজীবীদের বৃহদাংশই নীরব থাকে। অম্লান দত্ত (গণতন্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা, দৈনিক স্টেটসম্যান, ৩০.১২.০৯) এর প্রতিবাদ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি এখনও তসলিমাকে তাঁর প্রিয় পশ্চিমবাংলায় ফেরাতে পারেননি।

আরও বলি, যাঁরা হজে যাবেন, তাদের জন্য সরকার বিপুল অর্থব্যয় করে, বিমানবন্দরের কাছে বাড়ি তৈরি করে, কিন্তু হিন্দু তীর্থযাত্রীদের 'কর' দিতে হয়, বাস করার জন্য প্রবল শীতে খোলা মাঠে দিন-রাত কাটাতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ইমামদের বেতন দিতে হবে, তাহলে মন্দিরের পুরোহিতরা বাদ যাবেন কেন? পশ্চিমবঙ্গের সরকার সগর্বে জানায়, এই দেশে তারাই মাদ্রাসার জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে— টোলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' ইত্যাদি দ্বারা হিন্দুদের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদিকে নিয়মবদ্ধ করা হয়েছে, মুসলিমদের ক্ষেত্রে কেন রাষ্ট্র নীরব হয়ে আছে? ৪৪ নং অনুচ্ছেদে অভিন্ন দেওয়ানী আইন প্রণয়নের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে, সুপ্রীম কোর্টও কেন্দ্রকে আহমেদ খাঁ বনাম শাহবানো (১৯৮৫), ডিয়েঙ্গডে বনাম চোপরা (১৯৮৫) এবং মুদগল বনাম কেন্দ্রের (১৯৯৫) মামলায় অবিলম্বে সব ধর্মের মানুষের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী আইন রচনার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এই

সম্প্রদায়ের অসন্তোষের ভয়ে এখনও সেটা করা যায়নি। বিচারপতি কুলদীপ সিং মন্তব্য করেছিলেন, "no community can oppose the introduction of uniform civil code for all the citizens in the territory"। কিন্তু তার বদলে রাজীব সরকার ১৯৮৬ সালে মুসলিম মৌলবাদীদের স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করেছেন। 'প্রগতিশীল' কমিউনিস্ট সরকার মালাবারে মুসলিম জেলা তৈরি করেছে, তেমনি 'উদার' কেন্দ্রীয় সরকার (কংগ্রেস) মুর্শিদাবাদে খুলেছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা। ভারতে অন্তত এক কোটি বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী আছে, তারা ভোট দেয়। নেতাদের সাহায্য করে। কিন্তু তাদের ফেরত পাঠানো হয় না। পশ্চিমবঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক বিধানসভার ভোটের ফল তারাই নির্ধারিত করে।

এই সব বলা হলেই প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী, নেতা ও কর্মীরা অন্যদের 'সাম্প্রদায়িক' ও 'ধর্মান্ধ' বলে নিন্দা করে। এই প্রসঙ্গে তিনটে বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার।

প্রথমত, ১৯৯২ সালে বাবরি সৌধে আঘাত করা হলে সারা দেশের সেকুলারপন্থীরা তারস্বরে নিন্দা করেছিলেন করসেবকদের। ঘটনাটা উত্তরপ্রদেশের, কিন্তু সেই রাজ্য থেকে তো বটেই, আরও তিনটে রাজ্য থেকে বিজেপি সরকারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু সেটা আদিতে রামমন্দির ছিল, নাকি বাবরি মসজিদ, সেটা নিশ্চিত করে বলা গেছে কি? এর সঙ্গে কোটি কোটি হিন্দুর একটা আবেগ জড়িয়ে আছে, ফলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, পাশেএকটা মসজিদ করে দেওয়া হবে। এটাকে রামমন্দির হিসেবেই রাখা হোক। সৌদি আরবে রাস্তা করার জন্য বহু মসজিদকে ভাঙা হয়েছে, কিন্তু এখানে সেটা হলে সেকুলারপন্থীদের রাজনীতির বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টা গুজরাট দাঙ্গা।

অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও কঠোর ও সতর্ক হতে পারতেন। কিন্তু এটা ছিল একতরফা ব্যাপার? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, দাঙ্গায় ৭৯০ জন মুসলমান ও ২৫৪ জন হিন্দুর মৃত্যু ঘটেছিল। তাছাড়া একটা কথা প্রগতিশীলরা বলে না— এই দাঙ্গার আগে গোধরায় বহু করসেবককে হত্যা করা হয়েছিল ট্রেনে আগুন লাগানোর মাধ্যমে।

তৃতীয় বিষয়টা আরও মারাত্মক। প্রগতিশীলরা দাবি তুলেছে, শিক্ষা, চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিমদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দিতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে সংরক্ষণ জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদির জন্য নয় কেন? তাছাড়া তো কোনও ধরনের সংরক্ষণই অন্যায়। ব্যবস্থা— দেওয়া উচিত জাত-পাত দারিদ্র্যের মিশ্রণে পশ্চাদবর্তী মানুষদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা। সুপ্রীম কোর্টও বারবার বলেছে, তার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত আর্থিক কারণ, ধর্ম-জন্ম ইত্যাদি নয়।

ডঃ চিত্তব্রত পালিত লিখেছেন, 'ঝুটা প্রগতিবাদীরা শুধু হিন্দুদের দোষ দেখতে চায়, হিন্দু গৌরবের অধ্যায়গুলো মুছে দিতে চায়, সংখ্যাগুরুর গুরুত্বকে লঘু করে দেখে এবং মুসলমানদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়'— (সাম্প্রদায়িকতা, রবিসন্ধ্যা, জুন, ২০০৪)।

আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা এটাই।

★

ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সামরিক বাহিনী

মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী (অবঃ)

সামরিক বাহিনীতে জীবন অতিবাহিত করে সবসময় মনে হয়েছে হিন্দুত্ব কোনও ধর্মের (রিলিজিয়ন বা উপাসনা পদ্ধতি) বিষয় নয়। বরং বলা যায়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। জীবন ধারণের ভারতীয় একটা প্রণালী। হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ এক গৌরবের বিষয়। কারণ— হিন্দু ধর্মের কোথাও অন্য ধর্মের প্রতি বিরোধ অথবা অসম্মানের কোনও কথা নেই। বরং "যত মত তত পথই" বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে কোনও জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, আঞ্চলিক মানুষের কথা নেই। সর্বত্রই বিশ্বমানব, মানবিকতার মঙ্গল তথা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'র কল্যাণের কামনা করা হয়েছে। এই পরিবেশে সামরিক বাহিনীতে জীবনধারণ খুবই সহজ হয়ে যায়। সেখানে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খৃস্টান, কে শিখ, এর কোনও ধারণাই থাকে না। সীমান্তের বাঙ্কারে শত্রুপক্ষের গোলাগুলির নীচে সবাই ভারতীয়। আবার সেনাছাউনীতে সকল পরিবারই এক মহা-পরিবারের অংশ। ঈদের সেমিয়া, গুরুপরবের কড়া প্রসাদ, দুর্গাপূজার ভোগ এবং বড়দিনের কেক সবাই

সমান আনন্দে উপভোগ করা। আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকের রক্তস্রোত সর্বধর্মবর্ণ সম্প্রদায়ের মিলিত রক্তস্রোত প্রকৃত— ভারতীয় রক্তের ধারা। এটাই বোধহয় হিন্দুত্ব বা হিন্দুস্থানের ভারতীয় জাতীয়তা।

ভারতের সংবিধান যে ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজের কথা বলেছে, আমার ধারণা, তার সফল এবং একমাত্র প্রকাশ, সম্পূর্ণ অনুভব, মনে হয় ভারতীয় সেনা বাহিনীতেই ঘটেছে।

কিন্তু সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং তাদের বহু পরিবার ছাউনির ঘেরাটোপের মধ্যে সাধারণ ভারতীয় সমাজ থেকে একটু দূরেই থাকেন। ফলে ভারতের গ্রাম, শহরের এবং অন্য জনপদের সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তাদের সম্যক অভিজ্ঞতা থাকে না। ফলে একটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বাইরে আসায় মুখে যেমন গরম হাওয়ার হলকা লাগে, তেমনি সামরিক নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে আসা মাত্রই বাস্তব চিত্রটা মুখে চপেটাঘাত করে। ধর্ম নিরপেক্ষতার সংজ্ঞাটাই যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে এদেশে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বের সর্বত্র আজ সন্দেহের পাত্র। কারণ সন্ত্রাসবাদের আতুঁড়ঘর পাকিস্তান বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সন্ত্রাস রপ্তানী করেছে। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষকে প্রতিদিন তাদের ভারতীয়তার প্রমাণ দিতে হচ্ছে। ভারতীয় আই পি এল ক্রিকেটে পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের জায়গা না দেওয়ায় অভিনেতা শাহরুখ খান বিরূপ মন্তব্য করেন। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, তিনিও একটি দলের মালিক, তিনি কেন তাদের গ্রহণ করেননি। তারপর তাঁর ছবির বিরুদ্ধে শিবসেনা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করে। উলফার সঙ্গে গুলি বিনিময়ে অসমে এক হিন্দু বালক নিহত হয়। মানুষের ক্ষুব্ধ হওয়া খুব স্বাভাবিক। তার বিরুদ্ধে কিন্তু তেমন আন্দোলন হয়নি। কিন্তু গুলিবিনিময় হয়েছিল কাশ্মীরের এক গ্রামে, সেখানে এক মুসলমান বালক নিহত হন। সেই ঘটনা নিয়ে একটি তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠল। উভয় ঘটনাই দুঃখজনক। অন্যায়ভাবে হত্যা করলে শাস্তি হবেই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে নিরীহ মানুষ মারা যান। উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে, বাটালা হাউসে পাক-সমর্থক সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পুলিশের গুলিবিনিময় হলো। কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হলেন, নিহত হলেন একজন পুলিশ কর্তাও। কিন্তু পরবর্তী কালে এক রাজনৈতিক নেতা বাটালা হাউসের বিষয়টাকে পুলিশের সাজানো ঘটনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুললেন। অথচ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত এই ঘটনায় অসামঞ্জস্য কোনও কিছু দেখতে পাননি। মুসলমান সম্প্রদায় এককভাবে সর্বত্র নির্বাচনে জয়লাভ করার জায়গায় নেই, কিন্তু তাদের সমর্থন ভোটযুদ্ধে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতের বহু অঞ্চ লে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যালঘু তোষণে নেমে পড়েছে। ভোটযুদ্ধ বড় বালাই।

এমনকী ভারতের এক উঠতি ক্রিকেট খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্বাচিত হতে না পারায় ইসলামিক কার্ড খেলে বললেন, আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হওয়ায় খেলার সুযোগ পাইনি। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে রাজনৈতিক লাভালাভ পরিবেশ বিষাক্ত করে দিয়েছে। সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সমান সুযোগ, আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকারের অঙ্গীকার করে রেখেছে, সেখানে ধর্মের (রিলিজিয়ন) ভিত্তিতে কোনও সম্প্রদায়কে বঞ্চি ত করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সাচার কমিশন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সংখ্যার অনুপাতে সরকারি চাকরি, শিক্ষাক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক কম সংখ্যায় সুযোগ পেয়েছেন। তিনি এর কোনও কারণ জানিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু এটুকু সাধারণ জ্ঞান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যেখানে রাষ্ট্রের প্রধান, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়েছেন, তাঁরা কখনই বঞ্চি ত হয়নি। যোগ্যতা অনুসারে চাকুরি ও পেশায় উচ্চপদে যোগদানের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু যেখানে সংকীর্ণ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেছেন, তারা সেই সুযোগ থেকে যথার্থ কারণেই বঞ্চি ত হয়েছেন। এমনকী পাকিস্তানেও মাদ্রাসা শিক্ষা ছেড়ে রাষ্ট্রের মূল শিক্ষাধারা ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব উঠেছে। তবে একটি বিষয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপক্ষে নিশ্চ য়ই গিয়েছে। মণ্ডল কমিশন দলিত এবং পেছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজের জন্য শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংরক্ষণ করা হয়তো সম্ভব ছিল না। আজও বিভিন্ন আদালত ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের প্রয়াস নাকচ করে দিয়েছেন। যদি মণ্ডল কমিশন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন তাহলে সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষ অবশ্যই উপকৃত হতেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সেটাই মনে হয় সমীচীন হোত। সাচার কমিশনকেও হয়তো এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হোত না।

ভারতে সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ মরুদ্যান একমাত্র সামরিক বাহিনী, তার ভাবমূর্তি যেন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লাভের জন্য কদাপি ক্ষুণ্ণ হতে না পারে।

অন্য কোনও দিক দিয়ে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বঞ্চ নার শিকার বলে আমার মনে হয়নি। কোনও এক সভায় আমি এই মত প্রকাশ করি। সভাপতি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যিনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন। তিনি আমার বক্তব্য খণ্ডন করে বলেছিলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে বঞ্চ নার শিকার হয়েছেন। আমার সবিনয় নিবেদন, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে ওই অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য তিনি

কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অথবা কিভাবে প্রয়াস করে ছিলেন? তাহলে ভারতে হিন্দুত্ব অথবা ভারতীয়তা কি অবস্থায় রয়েছে? বলতে বাধা নেই যাঁরা হিন্দুত্বের কথা বলেন তাঁরা সাম্প্রদায়িক হিসাবে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন।

এমতাবস্থায় সন্ত্রাসবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় সামরিক বাহিনী, পুলিশবাহিনীসহ সমস্ত সুরক্ষা কর্মীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যাতে কোনওভাবেই নিরীহ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ওপর আঘাত না লাগে। কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক লাভালাভের প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগাতে দ্বিধা করবে না।

আশা করবো, ভারতীয় সোনাবাহিনীর ধর্মনিরপেক্ষ রূপটি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য ভারতের সমস্ত নাগরিক আন্তরিক প্রয়াস করবেন। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই শুধু বার বার বলতে পারি, ভারতে সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ মরুদ্যান একমাত্র সামরিক বাহিনী, তার ভাবমূর্তি যেন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লাভের জন্য কদাপি ক্ষুণ্ণ হতে না পারে। ★

হিন্দু নিগ্রহ
সেকাল থেকে একাল

নবকুমার ভট্টাচার্য

নিমাই যখন জন্মেছিলেন গৌড়ের সুলতান তখন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। সে সময়কার পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা লিখেছেন, 'সুলতানের অত্যাচারে হিন্দুরা সন্ত্রস্ত। রাজ দয়া পেতে রোজ বহুলোক মুসলমান হয়ে যেত।' এই সময়ের নবদ্বীপের চিত্র মুরারির কড়চায়—পাপব্যাধি সমাকুল নবদ্বীপে মহাপঙ্কিল

১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গা।

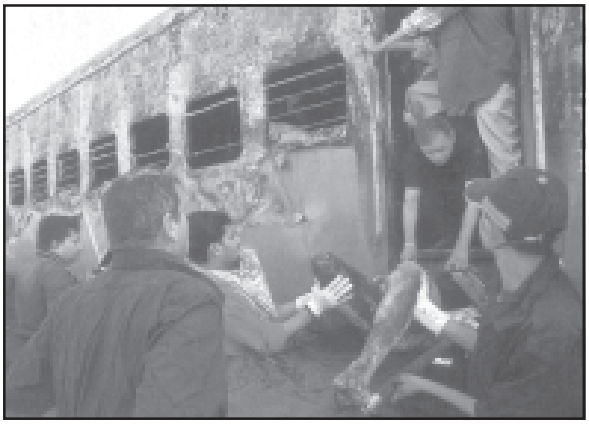

২০০২, গোধরায় দগ্ধ করসেবকদের কামরা।

ম্লেচ্ছজাতের করশোষণ চলছে নির্বিবাদে'। ১৪৮৬ সালেই আমরা দেখতে পাচ্ছি হিন্দুনিগ্রহ ও মুসলিমধর্মে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া। তবে নজিরবিহীনভাবে এই সময়ে আর একটি ঘটনাও ঘটল। বিস্মিত নদীয়াবাসী দেখল মুসলমান শাসনের অধীনে মুসলমান শাসককেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল এক অস্ত্রশস্ত্রহীন হিন্দুপ্রজা—তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু।

মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যখন অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে অরাজকতা অবক্ষয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তখন বাংলা এর ব্যতিক্রম ছিল না। আসলে ১৭০০ সালে মুর্শিদকুলি খান যখন বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং পরে যখন তিনি সুবাদার পদেও নিযুক্ত হন, তারপর থেকেই বাংলায় হিন্দু নিগ্রহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই নিগ্রহের ঘটনা আরও বৃদ্ধি পায় সিরাজের সময়। নাটোরের রাণী ভবানী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারিণী হয়ে মুর্শিদাবাদের সমীপে বড়নগরে গঙ্গাতীরবাসিনী হন। স্বামীর সঙ্গে তিনি যখন নাটোর থেকে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে আসেন, সম্ভবত সেই সময় বড়নগরের আবাস স্থাপিত হয়েছিল। ভবানী এখানে দেবালয় স্থাপন করে জপ-তপে মন দেন—মধ্যে মধ্যে নাটোর পরিদর্শনে যেতেন। নাটোরের জমিদার কন্যা বিধবা মেয়ে তারা এইখানেই তাঁর বিধবা মায়ের আশ্রয়ে ফিরে আসেন। কিশোরী তারাসুন্দরী তাঁর মায়ের রূপ পেয়েছিলেন। বাড়ি থেকে গঙ্গা দেখা যেত। তখন ১৭৫৬ সাল চলছে—তারার বয়স চৌদ্দ'র বেশি নয়। একদিন স্নান করে চুল এলিয়ে তিনি খোলা ছাদে উঠে এসেছেন এমন সময় গঙ্গাবক্ষে প্রমোদ তরণী থেকে তাঁর উপর তরুণ নবাবজাদা সিরাজউদ্দৌলা-র দৃষ্টি পড়ল। কথিত রয়েছে তাঁর রূপে উন্মত্ত হয়ে নবাবজাদা তারাহরণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। গঙ্গার অন্য পারে সাধকবাগে মস্তারাম বাবাজী নামে এক রামোপাসক ছিলেন যাঁর আখড়ায় রাণী ভবানী অনেক সাহায্য পাঠাতেন। ত্রিশূল হাতে সেই বৈষ্ণব আখড়ার রুদ্রমূর্তি সন্ন্যাসীরা তারা হরণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। পরে তারার মৃত্যু রটনা করে রাণী ভবানী কন্যাকে অন্যস্থানে

না পাঠালে বিপদ আরও বাড়তো। মোঘল অভিজাত মনসবদার সমাজের চোখে একজন বিধবা হিন্দু জমিদার তনয়ার লাঞ্ছনা এত চাঞ্চ ল্যকর ব্যাপার নয় যে কোনও ফার্সী ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ থাকবে। কিন্তু 'সিয়র-উল-মুতাখখিরীন' আদি গ্রন্থে এর সামান্য বিবরণ রয়েছে মাত্র। সিরাজের পক্ষে যে ফরাসী সেনাপতি অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তুত ছিলেন সেই মঁসিয় ল'র একটি উক্তি থেকে বর্ণিত ঘটনার সম্ভাব্যতার আভাস মেলে। মঁসিয় ল' তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন— হিন্দু মেয়েরা গঙ্গাতীরে স্নান করতে এলে তাদের মধ্যে কে কে সুন্দর, চরেদের মুখ থেকে সেই খবর যোগাড় করে সিরাজউদ্দৌল্লাহ তাদের ধরে আনবার জন্য ছোট ছোট নৌকায় অনুচরদের পাঠাতেন। সিরাজউদ্দৌল্লাহর এই জাতীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপের সাধারণ বর্ণনা দিয়েই তদানীন্তন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন খান ক্ষান্ত হয়েছেন।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ওই যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ-এর পতন হলেও এক শ্রেণীর মুসলমানের ধারণা ছিল যে, কোম্পানির শাসন ৫০ বছরের অধিক স্থায়ী হবে না। দেশে আবার মুসলিম শাসন ফিরে আসবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই হিন্দুদের প্রতিমা ভাঙচুর করা, হিন্দু মেয়েদের লাঞ্ছনা ও হিন্দু প্রতিবেশীকে নিগ্রহ করাই ছিল মুসলমানদের প্রধান কাজ। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় ১৩ জানুয়ারি, ১৮৫৭ সালে এরকম একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি ছিল 'হুগলী জেলার ব্যকুট গ্রামে এক হিন্দু বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় বাজনা বাজানো নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ হয়। এলাকার জমিদার ছিলেন মুসলমান। তাঁর প্ররোচনায় ভাসানের দিন কিছু মুসলমান হামলা করে প্রতিমা ভেঙে দেয় এবং হিন্দুদের মারধর করে।' ১৮৮১ সালে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় হিন্দু নিগ্রহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তত্ত্ববোধিনীর (১৮০২) আহ্বান ছিল— হিন্দু জাতিগণ এক মন এক প্রাণ হয়ে উঠুক। রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বৃটিশ শাসকের মদতে মুসলিম লীগ (১৯০৬) গঠন হয়। এর পরেই পূর্ববঙ্গে কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় মুসলমান কৃষককে ইসলামি রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে উত্তেজিত করা হয়। হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, এমনকী হিন্দু নারীর ওপর নির্যাতনের উস্কানিও ছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার মদতে এরকম প্রচার চালানো হয় যে, মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এখন হিন্দু মেয়েদের ওপর অত্যাচার করলে বা হিন্দু বিধবাদের নিকাহ করলে আর কোনও বাধা আসবে না।

ইসলাম প্রচারক-এর মতো পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'একদল মৌলবী মুসলমানদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছে যে, তোমরা হিন্দুর গৃহ লুণ্ঠন কর, হিন্দু বিধবাদিগকে নিকাহ কর, হিন্দু রমণীর সতীত্ব নাশ কর।' কুমিল্লা দাঙ্গা ও ময়মনসিংহের জামালপুরের দাঙ্গার (১৯০৭) সময় বাসন্তী প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়। বহু মন্দিরের ওপর হামলা এবং হিন্দু মেয়েদের ওপর অত্যাচার ঘটানো হয়েছিল (সুমিত সরকার, স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৪৪৭-৪৮)। এর সঙ্গে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্ররোচনাও প্রকটিত হয়ে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— তারা 'ইচ্ছেমতো' হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করছে। ১৯২০ সাল থেকে বঙ্গে নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ এবং লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে। 'সঞ্জীবনী'র মতো পত্রিকা প্রকাশ করে— 'আক্রমণকারীরা প্রধানত মুসলমান।' প্রবাসী পত্রিকায় শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গলার নারী নিগ্রহ' প্রবন্ধে তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল মুসলমান কর্তৃক নারী নিগ্রহের ঘটনা। ১৯২৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিম লীগের জন্ম হলেও ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বহরমপুর শহরের গোরাবাজার অঞ্চলে কৃষ্ণনাথ কলেজের কুমার হোস্টেলের মাঠে মুসলিম লীগের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় স্বয়ং মহম্মদ আলি জিন্না উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগের নিজস্ব একটি নীতি ও কর্মসূচী আছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, আমরা জোরের সঙ্গে দাবি করি যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কখনোই পরিবর্তন করা উচিত নয়। যতক্ষণ না একটি চুক্তির ভিত্তিতে তা করা হবে। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করছি, আগামী দিনে ভারতবর্ষে যে সংবিধান রচিত হবে, তা যার দ্বারাই রচিত হোক না কেন, সেখানে যেন মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ যথাযথ ভাবে সুরক্ষিত হয়।' ফলত এই ধরনের বক্তব্য দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জেলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জেলার বিভিন্ন প্রান্তেই মাঝে মাঝে কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু নিগ্রহ

সাল	প্রতিমা আক্রমণ	নারী নিগ্রহ ইভটিজিং	ধর্মান্তরকরণ	সংঘর্ষে আহত/নিহত	সংঘর্ষের ঘটনা
২০০০	৮	১১	২২	১৮	৫
২০০১	৭	২৬	৪২	৯	৮
২০০২	১১	৩৯	৪০	১৯	৬
২০০৩	১৬	৪৯	৫৬	২২	৮
২০০৪	১৫	৪৮	৫০	১৮	৬
২০০৫	১৯	৫৮	৮১	২৬	১১
২০০৬	২৬	৬১	৫৯	১৮	৮
২০০৭	২৯	৭২	৬৩	২৬	৯
২০০৮	২৯	৭৮	৫৩	৩১	৮

সূত্র ঃ জেলার ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলি থেকে পাওয়া তথ্য।

উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯২৪-২৫ এবং ১৯৪২-৪৩ সালে হিন্দু প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে জঙ্গীপুর মহকুমার সুতী ও রঘুনাথগঞ্জে মুসলমানরা প্রতিমা আক্রমণ করে। ১৯৪২-৪৩ সালের ঘটনায় জঙ্গীপুর মহকুমার তৎকালীন মহকুমা শাসক, যিনি মুসলিম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, স্বয়ং এই ঘটনায় উস্কানি দিয়েছিলেন— যা বঙ্গীয় বিধানসভার দুই মাননীয় সদস্য অতুল কুমার ও নবাবজাদা নাসারুল্লাকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে ধরা পড়ে। ১৯১৮ সালে কলকাতায় একটি ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছিল। এরপর ১৯২৬ সালে প্রথমে কলকাতায় (এপ্রিল) পরে ঢাকায় (জুলাই) এরপর ১৯৩০ সালে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে এবং ১৯৪১ সালে ঢাকায় দাঙ্গা হয়। সেকুলারবাদীরা বলে থাকেন, হিন্দু মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের ক্ষোভ থেকেই নাকি অনেক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ওপর আক্রমণ বা প্রতিমা নষ্ট করার মতো ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল অন্য উদ্দেশ্য। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় কমপক্ষে হাজার তিনেক হিন্দু খুন হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরেও হিন্দু প্রধান দেশে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নিগ্রহ চলছে। ১৯৮৮ সালে মুর্শিদাবাদে কাটরার মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা দাঙ্গা বাধায়। মুসলিমদের দ্বারা একটি কালীমন্দির সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ওই সালের ২৪ জুন ২০ হাজার মুসলিম বহরমপুরে সমবেত হয় এবং বহরমপুর থেকে কাশিমবাজার হয়ে লালবাগের দিকে রওনা হয়। সেদিনটি ছিল হিন্দুদের গঙ্গাপূজা। বহু লোক সেইদিন স্নান করে কাশিমবাজার ফিরছিলেন। ওই উন্মত্ত মুসলমানদের হাতে বহু হিন্দু লাঞ্ছিত হয়ে আহত হন।

হিন্দু নিগ্রহ আজও চলছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে হিন্দুরা আজও আক্রান্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে রাজনৈতিক হানাহানিতেও হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ কেশপুর, গড়বেতায় তৃণমূল- বিজেপিকে জব্দ করতে সি পি এম দল মুসলমান গুণ্ডাদের দিয়ে মহিলাদের লাঞ্ছিত করে। নন্দীগ্রামেও একই ঘটনা ঘটে। আজ পট পরিবর্তন হওয়ার ফলে তৃণমূলের মিছিলে আল্লা হো আকবর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পরিণতি কোথাও কোথাও একই হচ্ছে। তৃণমূলী মুসলমানরা সি পি এমের হিন্দু সমর্থকদের লাঞ্ছিত করছে। হিন্দু মন্দির অপবিত্র করা, হিন্দু নারীকে লাঞ্ছনা তো রয়েইছে। ★

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে বসন্ত উৎসব।

পদ্মাপারের হিন্দু

অরিন্দম মুখার্জী

গোপালগঞ্জ থেকে ফরিদপুর যেতে মধুমতী তীরে উলপুর। গ্রামে ঢোকার অল্প পর থেকেই শুরু হয়ে গেল পুরনো বাড়ির সারি। পথের ধারে পোর্সিলিনের অপূর্ব কাজ করা একটি সমাধি মন্দির। গাড়ি দাঁড় করাতে এগিয়ে এলেন অজয় ঘোষ দস্তিদার, একটি ছোট ওষুধের দোকানের মালিক। বললেন, একদা এই বর্ধিষ্ণু গ্রামে হিন্দু জমিদার বাড়ির সংখ্যাই ছিল প্রায় দু'শো। আজ কোনওক্রমে সত্তর-আশিটা টিকে আছে। সেগুলোরও কোনটা এতিমখানা, কোনটা মাদ্রাসা, বেশিরভাগ জবরদখল হয়ে গেছে। পথের পাশে একটা জীর্ণ বাড়ি দেখিয়ে বললেন, আমরা বহু লড়াই করে এটি দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করেছি। এই বাড়ির সামনে নতুন রামকৃষ্ণ মন্দির করব। উলপুরের টিকে থাকা কয়েকটা জমিদার বাড়ি দেখে ফেরার সময় অজয় বললেন, 'দাদা, একথা বলতে পারি এ গ্রামে আর নতুন করে কিছু হতে দেব না। লড়াই করে বাঁচার কৌশলটা এখন খানিকটা রপ্ত করেছি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক থাকলে পরের বার এসে নতুন মন্দির থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে কিন্তু যেতেই হবে।'

ঢাকাতে বাংলাদেশের দেবোত্তর ভূমি জবরদখল, শত্রুসম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিষয়ে কথা হচ্ছিল

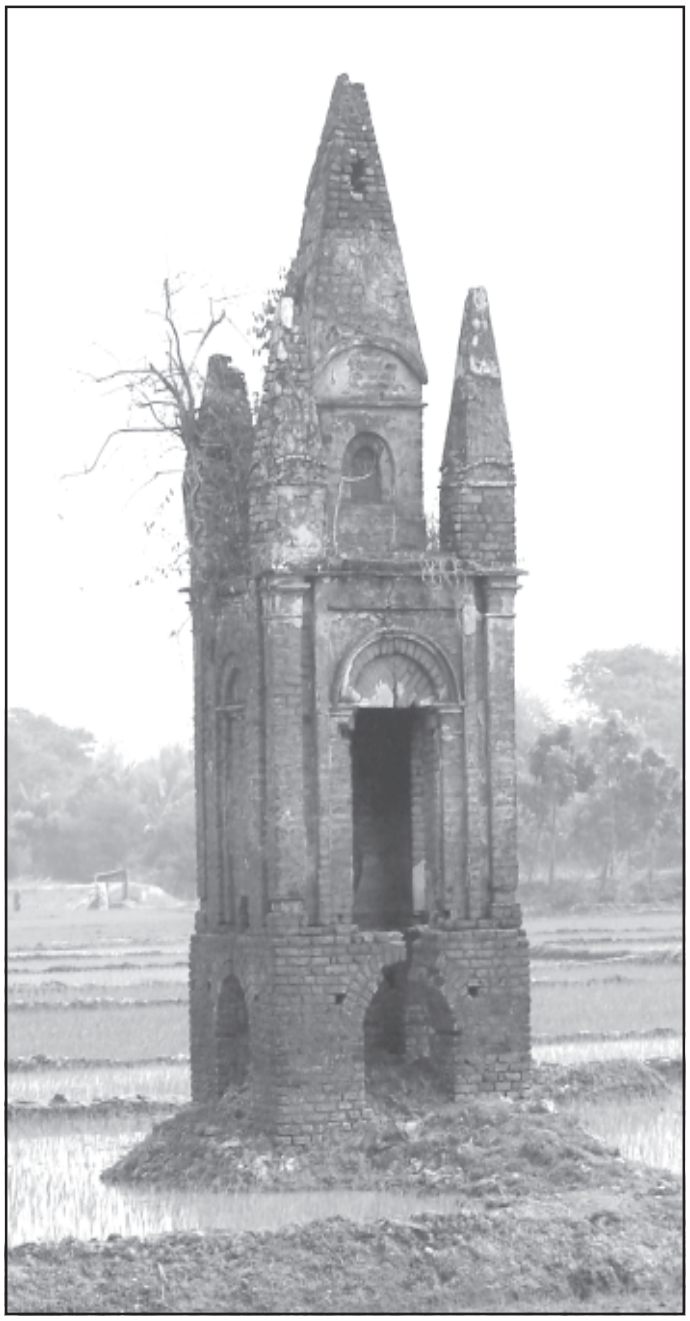

পরিত্যক্ত হিন্দু সমাধি মন্দির, উলপুর।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর সঙ্গে। বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন আমলা, বর্তমানে মানবাধিকার কর্মী রবীন্দ্রনাথবাবু বলছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংবিধান ছাড়া আর কিছু পায়নি। সেটাও এরশাদের আমলে চলে গেছিল। এখন আবার ফিরছে। বিগত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) মোট ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার বা ৬০ লক্ষ মানুষ শত্রু সম্পত্তি আইনে ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি দখলচ্যুত হয়েছে। এদেশে বত্রিশ হাজার ছয়শ' চুয়াত্তর (৩২,৬৭৩,৭১০৩) একর ভূমি দেবোত্তর। যার ভিতর বেহাত হয়ে গেছে ১৯৩০ একর। এইপ্রকারে ধারাবাহিক ভাবে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নানা ধরনের নিপীড়ন, উচ্ছেদ, বঞ্চ নাজনিত মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এবার যে সরকার এসেছে তারা তো অনেক কথা বলছে, শেষপর্যন্ত দেখা যাক কি হয়। আমরা ইতিমধ্যেই এই সরকারের কাছে দাবি রেখেছি, দেবোত্তর এবং শত্রু সম্পত্তি বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি গঠন করা হোক। যার মাধ্যমে বাংলাদেশের হিন্দুরা তাদের হৃত অধিকার ফিরে পাবে।

আমরা রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে রমনা উদ্যানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে রমনার অস্থায়ী মন্দিরের পূজারী সুভাষ মহারাজ এগিয়ে এলেন। কয়েক বছর ধরে এখানেই তিনি পৌরোহিত্যের দায়িত্ব পালন করছেন। দেখালেন, অস্থায়ী মন্দির ঘিরে নতুন তৈরি হওয়া কংক্রিটের পাঁচিল। রমনা উদ্যানে ২.২২ একর দেবোত্তর ভূমিতে একসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল ১২০ ফুট উঁচু কালীমন্দির। ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর কামানের গোলায় যা ধূলিসাৎ হয়। সেসময় সেনাবাহিনীর ব্রাসফায়ারে মন্দিরে আশ্রিত শতাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। দীর্ঘদিনের বহু সংগ্রামের পর বর্তমানে শুরু হয়েছে ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজ। মন্দির পরিসরে স্থাপিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকারে কালী, দুর্গা, সরস্বতী, মনসা, লোকনাথ তথা আনন্দময়ী মায়ের মন্দির। বর্তমানে সারা বছর ধরে নিয়মিত নানাবিধ হিন্দু পূজা-পার্বন উদ্‌যাপনের কথা বললেন সুভাষ মহারাজ। দেবোত্তর জমির কথা আদালতে মুচলেখা দিয়ে সরকার স্বীকার করে নিলেও এখনও এখানে অতীতের সেই মন্দির পুনর্নির্মাণে সরকারি আপত্তি রয়েছে। এই নিয়ে দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে।

রমনা উদ্যানের বিপরীতে বাংলা একাডেমী

চত্বরে চলছিল একুশে বইমেলা। মেলা চত্বরে সেদিন বসন্তের দখিনা বাতাস। বাসন্তী শাড়ি, গলায় গাঁদার মালা পরিহিতা সুবেশা তরুণীর ঢল নেমেছে সেখানে। সরস্বতী পূজার দিন অনভ্যাসের বাসন্তী রঙা শাড়ি পরা স্কুল ছাত্রী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস যেমন চোখে পড়ে কলকাতার রাস্তায়, এখানেও তার মধ্যে কোনও তফাৎ দেখতে পেলাম না। পাশেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে চলছে দেশের কেন্দ্রীয় বসন্ত উৎসব। এস্থানেও তারুণ্যের উত্তাল হাওয়া। মাইকে একটানা বেজে চলেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত। ফিরদৌসী চারুকলারই ছাত্রী। তার বাবা ঢাকার একটি কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক। ক্যাম্পাসে গাছের নীচে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। আলাপ হতে বলল, জানেন, কলকাতার আর্ট কলেজে একসময় আমার ছবি লিখতে শেখার খুব স্বপ্ন ছিল। অবন ঠাকুর থেকে গণেশ পাইন— সকলের আঁকা সম্পর্কেই সে ওয়াকিবহাল। ফিরদৌসী একবারই কলকাতায় এসেছে। তবে ফেস্‌বুকে কলকাতার অনেকের সঙ্গেই ওর সম্পর্ক। পশ্চিম বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির সম্পর্কে ওর বেশ শ্রদ্ধা। বলল, আরও মিশতে চাই ওপারের সঙ্গে। কিসের যে এত বিরোধ? পাশে বসা সেলিম রেজা বলল, এই রাজনীতি আমাদের অনেক পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। এদেশের একদল মানুষ কখনওই সম্প্রীতি চায় না। তাদের তো এই বসন্তোৎসবও পছন্দ নয়। এই উৎসব নাকি ইসলামবিরোধী।

বাংলাদেশ এই সময় নানাভাবে উৎসব মুখর। শিবরাত্রির দিন আমরা পৌঁছালাম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, বাড়ব কুণ্ড দর্শনে। সীতাকুণ্ডের আট কিমি আগে থেকেই ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় সড়ক প্রায় রুদ্ধ। অগণিত তীর্থযাত্রী এবং তাদের বাহনের সারিই এর জন্য দায়ী। প্রথমে আমরা সীতাকুণ্ডকে পিছনে ফেলে আরও ছয় কিমি এগিয়ে বাড়ব কুণ্ড দর্শন করতে গেলাম। মূল রাস্তা থেকে ঢুকে ৩ কিমি যাওয়ার পর ২০ মিনিটের হাঁটাপথ। বহু মানুষের পায়ে পায়ে ওঠা ধুলোর ঝড় ঠেলে পাহাড়ী পথ ধরে পৌঁছানো গেল বাড়ব কুণ্ড মন্দিরে। অতি প্রাচীন তীর্থ। কুণ্ডের ঠাণ্ডা জলে প্রাকৃতিক অগ্নিশিখা। বাড়ব কুণ্ড মন্দির পরিসরে বাংলার পরম্পরাগত চালা শ্রেণীর দশটি মন্দির। শিবরাত্রি উপলক্ষে সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ব কুণ্ড দর্শনের বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক 'হরি সাধনা ডেভেলপমেন্ট ফাউণ্ডেশন'-এর সভাপতি সোমনাথ দে। সোমনাথবাবু বললেন, দীর্ঘদিনের সরকারি উদাসীনতায় এই তীর্থ বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বর্তমানে তাঁদের উদ্যোগে তীর্থ পথের, মন্দিরের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। বললেন, আমরা সরকারের ওপর আর ভরসা রাখি না। দেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এই ধরনের প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণে কোনও তাগিদ নেই। আগে এই কুণ্ড থেকে যে লেলিহান অগ্নিশিখা বের হত, মন্দির ভেঙে কুণ্ড বুজে যাওয়ায় তা অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাই এসব দেখে আমরা বর্তমানে ঠিক করেছি, আমাদের সীমিত সাধ্যে যা করার তা আমরাই করব।

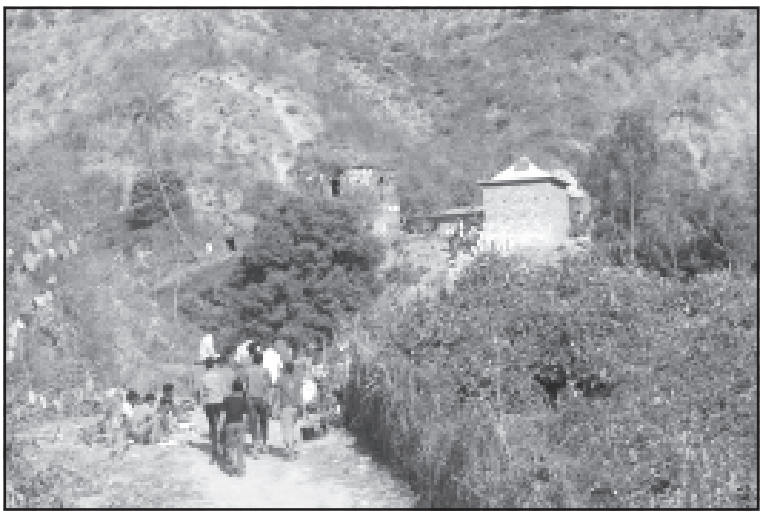

চট্টগ্রামে বাড়ব কুণ্ডের পথে ভক্তরা।

উলপুরে রায়চৌধুরীদের জমিদারবাড়ি।

বাড়ব কুণ্ড থেকে বিকালে আমরা সীতাকুণ্ড-চন্দ্রনাথ তীর্থের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এদিন সীতাকুণ্ড দৃশ্যতই মহাকুম্ভ। সম্প্রদায়-মতবাদ-গুরুপরম্পরা নির্বিশেষে এ তীর্থ বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের মহামিলন ক্ষেত্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ এদিন সমগ্র বাংলাদেশ থেকে এই তীর্থে সমাগত। পার্শ্ববর্তী মায়ানমার থেকেও দর্শনার্থীর ঢল নেমেছে। দিনের শেষে তীর্থযাত্রী আরও বাড়তে শুরু করেছে। ১০ কিমি পথ হেঁটে, অব্যবস্থার মধ্যেও বারোশো ফুট

পাহাড়ের চূড়ায় চন্দ্রনাথের মন্দির। তারই সঙ্গে আরও নানান তীর্থ। দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী, তবু সারা রাত মানুষের এই গমনাগমন চলবে। চন্দ্রনাথের শিবরাত্রির এই মেলাকে কুম্ভ মেলারই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। না দেখলে বিশ্বাস হয় না এ তীর্থ ভারতে না বাংলাদেশে।

বাড়ব কুণ্ড

পিরোজপুরের পুরুষোত্তম মঠে একটি সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ আমাদের ছিল। বসন্তোৎসব উপলক্ষে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের দুই সাংসদ আলহাজ এ কে এম এ আউয়াল এবং নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। দুইজনের বক্তব্যই চমকপ্রদ। প্রকাশ্য মঞ্চে কয়েক হাজার শ্রোতার সম্মুখে তাঁরা বললেন, বাংলাদেশের মানুষকে বুঝতে হবে তাদের প্রকৃত বন্ধু কে। একদিকে রয়েছে ভারত, যাদের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, যার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের সতেরো হাজার সেনা, যারা যুদ্ধের জন্য দুই কোটি উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিয়েছে, যারা আমাদের সর্বদা ভালই চেয়েছে। অপরপক্ষে রয়েছে বাঙালী বিদ্বেষী পাকিস্তান। যারা আমাদের তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, কয়েক লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছে। এখন সন্ত্রাসীদের মূল মদতদাতা তারাই। নারায়ণবাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, দেখুন, বাংলাদেশের হিন্দুরা সর্বদাই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে। তাই আমরা সবাই আওয়ামি লীগকে সমর্থন করি। নির্বাচনের পর এখন হিন্দুরা খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। তবে হিন্দুরাও বর্তমানে আগের থেকে অনেক বেশি সঙঘবদ্ধ। তাঁরা তাঁদের অধিকার আদায় করে নিতে শিখেছে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র যখন মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তখন সাধারণ নিরীহ মানুষের কি বা করার থাকে? তবে আশা রাখি শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেশের মানুষকে দেখিয়েছেন, তা যদি পূরণ হয় তবে আগামীতে এদেশের হিন্দু সমাজও তার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করার অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করার একটা রাস্তা খুঁজে পাবে। বারেবারে ধাক্কা খেতে খেতে আমরা বর্তমানে এটা বুঝতে পেরেছি, আমাদের বাঁচার পথ আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। বাইরে থেকে হয়তো নৈতিক সমর্থন পেতে পারি কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা আর তার রূপায়ণ আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। সংঘবদ্ধ তাই সবচেয়ে বড় শক্তি। বাংলাদেশের দুই কোটি হিন্দু এবিষয়ে আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন। আর তার সুফলও আমরা পেতে শুরু করেছি। এই সাফল্যকে ধরে রাখতে গেলে সুযোগ্য নেতৃত্ব নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে হবে। একমাত্র তাহলেই এধরনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রূপায়ণ করা সম্ভব। ★

অস্থায়ী মন্দির, রমনা, ঢাকা।

ফিজিতে রামনবমী উৎসব

বিদেশে হিন্দুত্ব

নৃপেন আচার্য্য

প্রাচীন ইতিহাস গবেষকদের অনেকেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে হিন্দুসভ্যতার পদচিহ্ন পৃথিবীর দেশে দেশে বহু জায়গায়। প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে হিন্দু concentration আজ শুধু ভারতে কেন! উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গত দুই সহস্রাব্দে খৃস্টীয় ও ইসলামী পতাকাধারীদের সশস্ত্র ও ঔপনিবেশিক আক্রমণের ফলে ভারতের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর মানচিত্র থেকে প্রাচীন ধর্মমতগুলি প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ভারতের বাইরে কোনওমতে বেঁচে গেছে একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত বালিতে।

বর্তমানকালে ভারতের বাইরে ভারতীয় হিন্দুদের দেশান্তরে যাত্রা (immigration) আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কৃষিশ্রমিক হিসেবে। তারা গিয়েছিল দলে দলে সুরিনাম, গায়না ইত্যাদি ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে, ফিজি, মালয়েশিয়া (রাবার প্লান্টাশানে) এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে, যেমন উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়াতে। এরপর আসছে তাঁদের কথা যাঁরা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা বা ভাগ্যান্বেষণের জন্য বিদেশে যান। পরাধীন ভারতেও অনেক অধিবাসী বিদেশে যেতেন এবং নানা কারণে দীর্ঘসময় কাটিয়ে এসেছেন। যখন পরাধীন ভারতের ছবি গ্লানিপূর্ণ সে সময় এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কয়েকজন ভারতীয় মনীষী পাশ্চাত্যে গিয়ে হিন্দুত্বের জয়পতাকা উড়িয়ে দেন। এঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করতে হয় পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের নাম।

স্বামী বিবেকানন্দের পরে উল্লেখযোগ্য নাম হবে প্রখ্যাত যোগী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের উত্তরসূরী স্বামী যোগানন্দের। তাঁর প্রতিষ্ঠান Self Realization Fellowship সংক্ষেপে SRE। আমেরিকা ইউরোপের আজ যে বহু মানুষ যোগের সুখ্যাতি করছেন এবং অসংখ্য যোগ স্কুল স্থাপন করেছেন বা যোগ শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে তার মূলে স্বামী

যোগানন্দের অবদান।

বিংশ শতাব্দীর যাটের দশকে যান মহর্ষি মহেশ যোগী এবং পরে ঢত্রন্থত্ব-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী। এঁদের বিশাল অনুগামী আছেন ছয়টি ইংরাজি-ভাষী দেশে যেমন আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে। এছাড়া প্রায় সবদেশেই সাঁইবাবার বহু অনুরাগী ভক্ত ও সাঁইভজনমণ্ডলী আছে।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী বিদেশবাসের প্রেক্ষিতে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার কথায় আসছি। গত শতাব্দীর যাটের দশকের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে দেখলাম লণ্ডনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার ছাড়া আর অন্য কোনও হিন্দু প্রতিষ্ঠান নেই। যতদূর মনে পড়েছে ১৯৬৪ সালে ইংলণ্ডে আসেন মহর্ষি মহেশ যোগী। তিনি হয়ে উঠলেন ইংলণ্ডের জনমানসে এক জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক নেতা ও শিক্ষক। এর দু-চার বছরের মধ্যে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে আফ্রিকা থেকে বহু সঙ্গতি সম্পন্ন ভারতীয় বংশোদ্ভুতরা বৃটেনে এসে ব্যবসা ও শিল্প স্থাপন আরম্ভ করেন। ফলে সত্তরের দশকে বিশেষ লক্ষণীয় হ'ল বৃটেনে হিন্দু জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হিন্দুত্বের জোরালো উপস্থিতি। পরে হিন্দুরা ভোটাধিকার অর্জন করে দাবীদার হ'ল নানা রাজনৈতিক ও ধর্মরক্ষার অধিকারের। এখন প্রায় দশ লক্ষ হিন্দুর বাস বৃটেনে। সেখানে স্কুলে সংস্কৃত শেখান আরম্ভ হয়েছে। বহু মন্দির তৈরী হয়েছে। এখন লণ্ডনের নীসডেনে হিন্দু স্বামী নারায়ণ মন্দির সৌন্দর্য শিল্পকলা এবং বিশালত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাছাড়া বৃটেনের হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙঘ যুবক ও কিশোরদের চরিত্রগঠন ও সমাজগঠনের এবং শিশুশিক্ষার মাধ্যমে এমন সাড়া ফেলেছে যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার প্রথম জীবনে Immigration-এর ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রক্ষণশীলদলের রাজত্বকালেই হিন্দু স্বয়ংসেবকদের একটি অনুষ্ঠানে আসেন ভারতীয় শাড়ী পরে এবং হিন্দুদের নীতিধর্মপরায়ণতা ও সুনাগরিক আখ্যা দিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সত্তরের দশকে আসি ইরানের রাজধানী তেহেরানে। এখানে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রাধান্য। তখন চলছে পল্লবী রাজবংশীয় রেজা শাহের শাসন। শাহের সময় বেশ কয়েকজন ইরাণীকে বৈষ্ণবমতাবলম্বী হ'তে দেখেছি। তাঁদের মতো লোকের আগ্রহাতিশয্যে এবং অর্থানুকুল্যে শ্রীমদভগবদ্‌গীতা ফারসি ও আরবিতে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ইরানে দু'বছর কাটানোর পর আসি কোয়েটে। তখনও খোমেনির অভ্যুদয় হয়নি ইরানে। কোয়েটে এসে দেখি সেখানে প্রায় লক্ষাধিক ভারতীয় হিন্দু কর্মরত, কিন্তু ইসলামি অনুশাসনের জন্য প্রকাশ্যে কোনও হিন্দু মন্দির করা সম্ভব ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যের বহু জায়গায় হিন্দুরা ভাল সংখ্যায় থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শাসনের প্রেক্ষিতে হিন্দুমন্দির স্থাপন সম্ভব হয়নি। তবে ওই সব জায়গায় স্বর্গীয় স্বামী চিন্ময়ানন্দজী বা স্বামী দয়ানন্দজীর মতো কয়েকজন প্রেমিক সন্ন্যাসীসন্তের ঘন ঘন দর্শনদান ও আলাপ আলোচনা হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার আহার জোগাত। এই লেখকের পরিচিতা এক ভদ্রমহিলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা মা-র ছবি স্যুটকেশ রাখার জন্য ভয়ানক জেরার সম্মুখীন হন, কাস্টমস যখন ছবিগুলি বাজেয়াপ্ত করতে উদ্যত তখন ভদ্রমহিলা ছবিগুলি তাঁর নিজের ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার বলে নিস্তার পান।

আশির দশকে চলে আসি আমেরিকায়। এখন কানাডা ও আমেরিকায় প্রায় তিরিশ লক্ষ হিন্দুর বাস। দুই দেশে ছোটবড় প্রায় শতাধিক মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই সব মন্দির ছাড়াও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার, মহর্ষি মহেশ যোগী, SRE (যোগানন্দজীর) চিন্ময় মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ইত্যাদি অনেকগুলি মঠ ও আশ্রম আছে। সেখানে প্রায় সর্বত্রই হিন্দুধর্মের নিয়মিত তত্ত্ব আলোচনা বা পূজা-পার্বনাদির ব্যবস্থা আছে। ফিলাডেলফিয়ার অনতিদূরে স্বামী দয়ানন্দজী আর্যবিদ্যা গুরুকুলম নামে একটি বড় সেন্টার করেছেন— এখানে নিয়মিত বেদান্ত শাস্ত্রের শিক্ষার জন্য short ও long কোর্সের ব্যবস্থা আছে। প্রায় সব মন্দিরগুলিতে Youth Development Programme আছে—সেখানে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি সংস্কার ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া উত্তর আমেরিকায় হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ছুড্রত্রগ্ন ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ছদ্দড্রত্নট্রগ্ন যথেষ্ট সক্রিয়। বহু হিন্দু যুবক এবং প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ রা এই সংস্থাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন। অধিকাংশ জায়গাতেই সাপ্তাহিক বা মাসিক শাখা চলে। বছরে প্রায় প্রতিটি বড় শহরে এই সংস্থাগুলির বেশ কয়েকটি অধিবেশন হয়। বর্তমান I.T. Industry-র দৌলতে বহু ভারতীয় হিন্দু যুবক ২/৩ বছরের জন্য উত্তর আমেরিকা আসছেন কাজ করতে। তাঁদের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশ অবাঙালীরাই সঙ্ঘের সাথে যুক্ত হন এবং অধিক সংখ্যায় অধিবেশনগুলিতে এসে সঙ্ঘের কার্যক্রমগুলি সমৃদ্ধ করেন। দেখা যায় প্রায় সবারই চিন্তা পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে। তাই হিন্দু মন্দিরগুলিতে বা হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ছুড্রত্রগ্ন শাখায় শিশুদের বা কিশোরদের জন্য বালগোকুলম চলছে।

এখানে দুএকটি-কথা বলা প্রয়োজন। দেশে প্রায়ই শোনা যায় প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য; যেমন ওদের স্বদেশ নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা বা ভালবাসা নেই, ওরা তো নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশ ছেড়েছেন ইত্যাদি। এসব মন্তব্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সত্য হতে পারে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে তাঁদের জন্য ওই সব দেশ লাল কার্পেট নিয়ে অভিনন্দন জানায়নি। এটা কোনও অত্যুক্তি নয় যে ভারতের ছবি ও মর্যাদা এই সব পশ্চিমী দেশগুলিতে আজ যেখানে পৌঁছেছে তাতে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদান প্রভূত আছে। এটাও মনে রাখা উচিত যে প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকাংশই ভারতভূমিকে যথেষ্ট ভালবাসেন। বিদেশে তাঁদের পরিচয় ভারতীয় বংশোদ্ভুত হিসেবে বা হিন্দু হিসেবে। তাঁদের সন্তানসন্ততিকে নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিয়ে স্কুল কলেজে স্থান করে নিতে হয় এবং সেখানে অন্যধর্ম প্রচারকদের আগ্রাসী কূট-কৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এসবের প্রেক্ষিতে প্রবাসী হিন্দুদের কথা ভাবতেই হয়।

এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রবাসী হিন্দুদের প্রচেষ্টায় অনেকগুলি পাশ্চাত্যদেশে পঠনপাঠন আরম্ভ হয়েছে। আমেরিকার কয়েকটি

বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা হিন্দু সভ্যতা পড়াবার জন্য অনুদান দিয়েছেন। মহর্ষি মহেশ যোগী আমেরিকাতে lowa state এ Hindu University প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু ছাত্রছাত্রী হিন্দু শাস্ত্র ও সভ্যতা অধ্যয়ন করছেন। অন্যান্য প্রবাসী ভারতীয়রা Florida state এ একটি Hindu University স্থাপন করেছেন। উদ্দেশ্য হিন্দুসভ্যতার প্রসার। আমেরিকার স্বয়ংসেবকরা অন্য একটি সংস্থা করেছেন Hindu American Foundation বা সংক্ষেপে HAF নামে হিন্দুত্বের অনুকূলে চলছে এঁদের কাজ। যেমন, বিভিন্ন state এর স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুধর্ম শেখানোর নামে হিন্দুদের সম্বন্ধে অপমানকর মন্তব্য বা বিকৃত আলোচনা থাকত। কয়েকবছর আগে California State Education Board-এর বিরুদ্ধে HAF আন্দোলন শুরু করে এবং বিবাদ শেষ পর্যন্ত আদালতে পৌঁছায়। HAF এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন Expert witness হিসেবে দুটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্বের নামী অধ্যাপক এবং ভারত থেকে যান কম্যুনিস্ট ঐতিহাসিক শ্রীমতী রোমিলা থাপার। তৎসত্ত্বেও HAF জয়ী হয় এবং আদালত পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ Disputed Item গুলি পরিবর্তনের আদেশ দেন। বাকীগুলি জন্য মামলা এখনও চলছে। ইং ২০০১ সনের ১১ই সেপ্টেম্বরের World Tower ধ্বংসে যাঁরা নিহত হন তাঁদের মধ্যে কিছু হিন্দু বংশোদ্ভুত লোকও ছিলেন। ধ্বংসের অব্যবহিত পরে সরকার আয়োজিত শোকসভায় অন্যান্যধর্মের প্রতিনিধির সহিত কোনও হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি না থাকার জন্য ভারতীয় হিন্দুরা প্রেসিডেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানায়।

লণ্ডনে স্বামীনারায়ণ মন্দির

ফলে তার পরবর্তী সমস্ত অনুষ্ঠানেই হিন্দু পুরোহিত উপস্থিত থেকেছেন। এমন কী আমেরিকান সংসদীয় অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে ক্রিশ্চানদের সঙ্গে হিন্দু বৈদিক প্রার্থনাও আরম্ভ হয়েছে। দেওয়ালী উপলক্ষে হিন্দু দেবতার ছবি নিয়ে বৃটেন এবং আমেরিকায় ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। গত বছরের দেওয়ালীতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান। এভাবে দেখা যায় বিদেশে হিন্দুত্বের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। এখন আমাদের হিন্দুদেরই দেশে বিদেশে যেখানে থাকি না কেন, আরও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও সদাচারী হ'তে হবে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন এই প্রার্থনা। জয় হিন্দ্। ★

এত নিন্দা, এত আক্রোশ, তবু

আধুনিক হিন্দুর বিপ্লব রামমন্দির আন্দোলন

পবিত্র ঘোষ

ঝড়ের সঙ্গে আসে আঁধি। ধুলোয় ঢাকে চোখ। অযোধ্যার ঝড়ে বহু কিছু তচনচ হয়েছে, বহুজনের দৃষ্টি হয়েছে ঝাপসা। তাই যুগলক্ষণ তাঁদের নজরে পড়েনি।

বার্লিনের পাঁচিল ভাঙার দিন থেকে পাল্টে গিয়েছিল ইউরোপের ইতিহাস। কমিউনিস্ট শাসনের অপলাপ থেকে ইউরোপ হয়েছিল মুক্ত। বাবরি মসজিদের পতনের সময় থেকে ভারতেও বইছে পালা বদলের হাওয়া। এ দেশের ইতিহাসও নিয়েছে নতুন বাঁক।

অনড় রামলালা।
ভব্য মন্দিরের প্রতীক্ষায়।

অনেকের অভিযোগ, বাবরি মসজিদের পতনে জয় হয়েছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার। তাই তার বিরুদ্ধে জোট বাঁধার পড়িমরি চেষ্টা চলছে। কংগ্রেস, সি পি এম, জনতা দল, মুসলিম লিগ ইত্যাদি বহু মতের ও বহু রঙের দলগুলি এক লাইনে এসে দাঁড়াচ্ছে। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার প্রবাদ এতদিনে সত্য হলো।

বি জে পি-শিবসেনা ছাড়া যত দল পার্লামেন্টে আছে সবাই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধেছে। পার্লামেন্টে যারা নেই সেসব দলও হয়েছে একই নৌকার আরোহী। বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদপত্রের কলমচিরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে রোজই ফাঁসিকাঠে ঝোলাচ্ছেন।

তাঁদের সম্মিলিত শক্তির আক্রমণ ও প্রতিরোধ গত চার-পাঁচ বছর একটানা চললেও এখন পর্যন্ত হয়েছে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কেন না এই চার পাঁচ বছরেই রামজন্মস্থান মন্দির গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। নিন্দা-সমালোচনা-ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও বাধাবিপত্তি যত তীব্র হয়েছে, মন্দিরের আন্দোলনও তত শক্তিসঞ্চয় করে সংহত ও দুর্বার হয়েছে। সরকারি ধমক ও প্যাঁচ-পয়জার, তথাকথিত প্রগতিবাদী রাজনীতির বিষফণা, বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুরধার তর্ক বিলকুল বৃথা হয়ে গেল। এত তড়পানির নিট ফল হয়েছে একটাই। বাবরি মসজিদ আর নেই।

৬ ডিসেম্বরের (১৯৯২) পর থেকে বিতর্ক তাই নতুন পথে মোড় নেবে বলে আশা করা গিয়েছিল। বাস্তবের বিকাশমান নতুন রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাল্টাতে হয় বিশ্লেষণের ধারা। বাস্তব যখন ছোটে তখন তত্ত্বের পসারিদের বাসি বুলিগুলি হয়ে যায় বাতিল। বিকোবার হাটে ব্যাখ্যারও তাই নতুন পদ্ধতি-প্রকরণ দরকার।

নিন্দামন্দ যাই করা হোক না কেন, রামমন্দির আন্দোলন উপলক্ষে ভারতে যে জনশক্তি মাথা তুলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী (নরসীমা রাও) নিজে বলেছেন, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ রক্ষা করতে তাঁর সরকার পাঠিয়েছিল মোট ১৯৫ কোম্পানি আধা-সামরিক বাহিনী। ২৪ নভেম্বর থেকে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এদের মোতায়েন করা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল কাঁদানে গ্যাস, রবার বুলেট, প্ল্যাস্টিক পেলেট, নয়শটি গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র, প্রয়োজনীয় সবরকম সুযোগসুবিধা ও ব্যবস্থাদি। এই আধা-সামরিক বাহিনীগুলির মধ্যে ছিল ঃ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ, মহিলা রিজার্ভ পুলিশ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড, কম্যান্ডো ফোর্স, বোমা নষ্ট করার টিম, গন্ধশোঁকা কুকুর স্কোয়াড ইত্যাদি। এইসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও ছিল।

সবই হয়ে গিয়েছিল সঙের পুতুল। বাবরি মসজিদ উধাও হয়েছিল পলকে। কিন্তু করসেবকদের অপারেশন তারপরও থামেনি। ভূতপূর্ব মসজিদের স্থানটিতেই তারা বানিয়েছে অস্থায়ী মন্দির। সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামলালা বিগ্রহ। চলছে পূজার্চনা।

চেঁচামেচি যতই হোক, এই হলো অনস্বীকার্য সত্য, সংশয়াতীত বাস্তব। সংবাদপত্র, রাজনৈতিক মঞ্চ ও পার্লামেন্টে গলাবাজি হয়েছে বিস্তর। কিন্তু সবই নিছক শোক প্রস্তাবের মতো। যে বাবরি মসজিদ ধরাতলে নেই তারই জন্য বুক চাপড়ানো।

শোকের সঙ্গেই এসেছিল আক্রোশ। তার পরিধি কাবুল থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বললেও কম বলা হবে। রাষ্ট্রসঙেঘ ইসলামিক দেশগুলি একযোগে মহাসচিব বুত্রোস ঘালির কাছে নালিশ জানিয়েছে। ঘালিও বাবরি মসজিদ পুনরুজ্জীবিত করার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লিকে। ইরান পালন করেছে উপর্যুপরি বন্ধ। আরব আমিরশাহিতে হয়েছে দাঙ্গা। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হয়েছে হিন্দু জবাই। নারী অপহৃতা। মন্দির চূর্ণ।

বাবরি মসজিদের পতনে দুনিয়া কেঁপে উঠেছে। অন্ততপক্ষে মুসলিম দুনিয়া তো বটেই। ভারতীয় উপমহাদেশে আলোড়ন থামেনি। প্রচণ্ড আলোড়নের এই হয়তো শুরু। এ দেশের মুসলমানরা ভয় পাচ্ছেন। বহু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তাঁদের তাড়া করছে।

গত কয়েক বছর যাবৎ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যাঁরা হল্লাবাজি করছেন তাঁরা এ জন্য কম দায়ী নন। তাঁরা বরাবর ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল প্রবাহকে অস্বীকার করেছেন, ইতিহাসের অন্তর্নিহিত তাগিদকে বুঝতে অবহেলা দেখিয়েছেন। এই ভ্রান্তির পরিণামরূপে কালস্রোতে তাঁরাই ডুবে যাচ্ছেন।

মসজিদ ভাঙতে ভারতীয়রা কখনও হাত পাকায়নি। ভারতীয় তথা হিন্দু ঐতিহ্যে এটা বাধে। ইবন বতুতার লেখা থেকে জানা যায়, কালিকটের হিন্দু রাজা জামোরিন ছিলেন মসজিদের পৃষ্ঠপোষক। দশম শতকে মুসলিম পর্যটক মাসুদি পশ্চিম ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ করে লিখে গিয়েছেন, ওই অঞ্চলের হিন্দু বল্লভি শাসকরা নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গুজরাতের সব বন্দরে ছিল নিত্য নমাজ মুখরিত মসজিদ। যেমন ছিল মালাবারে। পঞ্চ মসজিদ ছিল সেই আদিযুগের কুইলন শহরের অলঙ্কার।

কিন্তু এই আস্থা, শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার কী প্রতিদান পেয়েছিল হিন্দুরা? মুসলিম বিজেতা ও শাসকদের ব্যসনই ছিল হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করা, দেববিগ্রহ চূর্ণ করা, হিন্দুধর্মকে লাঞ্ছিত করা। গজনির মাহমুদ থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বিশ শতকের শেষে এসেও এই ধারা শুকিয়েছে কিনা ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ালেই তা বোঝা যাবে। পাকিস্তানি মিলিটারি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল ঢাকার বিখ্যাত রমনার কালীবাড়ি। এরশাদের আমলে ভাঙা হয়েছিল ঢাকেশ্বরী মন্দির। গত দু'বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ধ্বংস করা হয়েছে বারোশ হিন্দু মন্দির। লাহোরে এবার চূর্ণ করা হয়েছে মতিলাল নেহরু স্মৃতিযুক্ত কৃষ্ণ মন্দির। ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীর উপত্যকায় চুরমার ও অপবিত্র করা হয়েছে একশরও বেশি দেবমন্দির।

একমাত্র বাবরি মসজিদের গায়ে হাত পড়তেই দুনিয়ার মুসলিম গর্জে উঠেছে। সেইসঙ্গে গলা মিলিয়েছেন হিন্দু নেতা এবং বুদ্ধি জীবীরা। বালক-বালিকারাও সংবাদপত্রে পত্র পাঠাচ্ছে এবং সম্পাদকরা তা পাতা জুড়ে ছাপাচ্ছেন। অথচ মুসলিমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দুর মন্দির ভাঙছেন, ভেঙেই চলেছেন। সেজন্য মুসলিমদের অনুতাপ করতে দেখা যায়নি, হিন্দু বুদ্ধি জীবীরা টুঁ শব্দটিও করেননি, বিশ্বে হয়নি শোরগোল। মার্কসবাদী পণ্ডিতরা হিন্দুকে নড়াচড়া করতে দেখলেই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে মুখ ও কলম ছোটান। মুসলিম বর্বরতার বিরুদ্ধে আঙুলটি তুলতেও তাঁরা নারাজ।

তবু বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে তা মসজিদ বলে নয়। মসজিদই যদি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হোত তবে অযোধ্যা-ফৈজাবাদ এলাকায় আরও মসজিদ ছিল। ভারতের সব কোণে মসজিদ থেকে ওঠে আজানের ধ্বনি। কোথাও শাবল গাঁইতি নিয়ে কেউ মসজিদ ভাঙতে যায় না। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় ভিন্ন মসজিদের নিরাপত্তা ভারতে সুনিশ্চিত।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অযোধ্যায় করসেবকরা জড় হয়েছিলেন মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে আঘাতে দিতে নয়, ইসলামের অবমাননা করতেও নয়, এমনকি মসজিদ ভাঙতেও নয়। তাঁরা গিয়েছিলেন ভারতে বিদেশিকৃত বর্বরতার অন্যতম নিদর্শন লোপাট করতে। আল্লার উপাসনাগৃহ হিন্দুর দৃষ্টিতে পবিত্র স্থান। কিন্তু বিদেশি বাবরের দস্যুতাকেও পবিত্র বলে মানতে হবে কেন? বাবর কিংবা তাঁর সেনাপতি মীর বাঁকি হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাবোধকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই বেছে বেছে এমন জায়গায় মসজিদটি বানিয়েছিলেন, হিন্দু ঐতিহ্যে যা ছিল পুণ্যপীঠ। হিন্দুর দাসত্ব কায়েম করতে হলে তার আত্মমর্যাদার হানি ঘটানো ছিল দরকার। বাবরের বাবরি মসজিদ সে যুগে সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এত কাল পরও হিন্দুর সেই অপমানের সৌধ মুসলিমদের কাছে সম্ভ্রমের সামগ্রী। বাবরি মসজিদ যেন মুসলিমদের জানমালেরও অধিক। রামজন্মস্থান মন্দির যাতে না হতে পারে সেজন্য হিন্দু বুদ্ধি জীবী, রাজনৈতিক দল

ও সরকার এখনও এককাট্টা। ইদানীং ঢোক গিলে তাঁরা বলছেন, অযোধ্যায় রামের মন্দির হতে পারে, কিন্তু যে স্থানটিকে হিন্দুরা রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলে শতশত শতাব্দী ধরে বিশ্বাস করে এসেছে ঠিক সেই স্থানটিতে মন্দির তুলতে দেওয়া হবে না। কারণ তাতে মুসলিমদের সায় নেই।

মুসলমানের মনোভাবের প্রতি হিন্দুর সহানুভূতি এতদূর রয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজ কোনওরকম আপোস করতে রাজি নন। বাবরের বর্বরতার সাক্ষ্য অটুট রাখতে তাঁরা ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁদের দৃষ্টিতে হিন্দুর মনোভাব অপাংক্তেয়, মূল্যহীন। তাই তা বিবেচনাযোগ্য নয়। এক হাজার বছরেরও বেশি মুসলিমরা ভারতীয় উপমহাদেশে বাস করছেন। তবু হিন্দুর মনের ব্যথা কোথায় লুকিয়ে আছে, সে খবর নেবার তাঁরা দরকার বোধ করেননি। মুসলিম মানসের এই বিমুখতাকে হাওয়া দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছেন যেমন মৌলবাদী মুসলিম নেতারা, তেমনই ভোটভিক্ষু রাজনৈতিক দলগুলি। সুখের পায়রা বুদ্ধি জীবীরা ঝুঁকি এড়াতে হয়েছেন চলতি হাওয়ার পন্থী।

সাময়িক প্রয়োজনে, স্বার্থের গরজে আমরা সত্য লুকোতে চেষ্টা করি। সুবিধামাফিক বিস্মৃতি আমাদের স্বভাব। কিন্তু ইতিহাস কিছুই ভোলে না। সত্যের কণাটুকুও চিরস্থায়ী আশ্রয় পায় জাতীয় মগ্নচৈতন্যে। সময় ও সুযোগ গেলেই আপাত বিস্মৃতির আড়াল থেকে পুরনো সত্য নতুন করে হানা দেয়। ভারতের জাতীয় চৈতন্য আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে স্ফুরিত হওয়ায় সত্য নিয়ে লুকোচুরি আর সম্ভব নয়।

এই জাতীয় চৈতন্যের দোলায় আপামর জনসাধারণও দুলছে। তাই এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোত দিনে দিনে শক্তিসঞ্চয় করছে। এই স্রোতকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অবমাননা করা চলে, কিন্তু তার গতিরোধ করা অসম্ভব। আমাদের বিদ্বান প্রধানমন্ত্রী সে কথা বোঝেন বলেই কঠোর হতে গিয়েও দ্বিধাগ্রস্ত হন। তিনি জানেন, গঙ্গার ঢল রুখতে গিয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতও ভেসে গিয়েছিল। ভারতের অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতার দুর্নাম দিয়ে যাঁরা রুখতে চাইছেন তাঁরাও ভেসে যাবেন। ★

[সৌজন্যে ঃ বর্তমান ঃ ৭.১২.১৯৯২]

Swastika RNI No. 5257/57
12 April - 2010, Nababarsha Sankhya
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

দাম ঃ ১০.০০ টাকা